ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

কল্যাণীয়

শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে
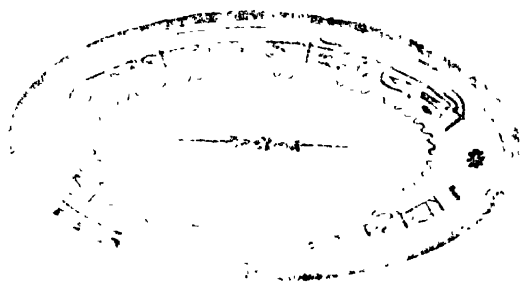
বিজ্ঞপ্তি

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হোলো। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আমার কিছু বাদপ্রতিবাদ হয়েছে, তাঁদের তর্কের উত্তর এই গ্রন্থের অন্তর্গত করেছি। এই উপলক্ষ্যে বলা আবশ্যক, তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি। ইতি—২০ আষাঢ়, ১৩৪৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

সূচী

পরিশিষ্ট—

ছন্দ

ছন্দের অর্থ

শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্য্যক্‌ভঙ্গী ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেন না তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্ব্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্ব্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস—অর্থাৎ সে-জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।

এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার—অনির্ব্বচনীয় শব্দটার মানে অভাবনীয় নয়। তা যদি হোত তাহোলে ওটা কাব্যে অকাব্যে কুকাব্যে কোথাও কোনো কাজে লাগত না। বস্তু-পদার্থের সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় কিন্তু রস-পদার্থের করা যায় না। অথচ রস আমাদের একান্ত অনুভূতির বিষয়। গোলাপকে আমরা বস্তুরূপে জানি, আর গোলাপকে আমরা রসরূপে পাই। এর মধ্যে বস্তু জানাকে আমরা সাদা কথায় তার আকার আয়তন ভার কোমলতা প্রভৃতি বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু রস-পাওয়া এমন একটি অখণ্ড ব্যাপার যে তাকে তেমন ক'রে সাদা কথায় বর্ণনা করা যায় না—কিন্তু তাই ব'লেই সেটা অলৌকিক অদ্ভুত অসামান্য কিছুই নয়। বরঞ্চ রসের অনুভূতি বস্তু-জ্ঞানের চেয়ে আরো নিকটতর প্রবলতর গভীরতর। এই জন্য গোলাপের আনন্দকে আমরা যখন অন্যের মনে সঞ্চার করতে চাই তখন একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার রাস্তা দিয়েই ক'রে থাকি। তফাৎ এই, বস্তু-অভিজ্ঞতার ভাষা সাদা কথার বিশেষণ, কিন্তু রস-অভিজ্ঞতার ভাষা আকার ইঙ্গিত সুর এবং রূপক।

পুরুষমানুষের যে-পরিচয়ে তিনি আপিসের বড়ো বাবু সেটা আপিসের খাতা পত্র দেখলেই জানা যায়, কিন্তু মেয়ের যে-পরিচয়ে তিনি গৃহলক্ষ্মী সেটা প্রকাশের জন্যে তাঁর সিঁথেয় সিঁদূর, তাঁর হাতে কঙ্কণ। অর্থাৎ এটার মধ্যে রূপক চাই, অলঙ্কার চাই, কেননা কেবল-মাত্র তথ্যের চেয়ে এ যে বেশি—এর পরিচয় শুধু জ্ঞানে নয় হৃদয়ে। ঐ যে গৃহলক্ষ্মীকে লক্ষ্মী বলা গেল এইটেই তো হোলো একটা কথার ইসারা মাত্র—অথচ আপিসের বড়ো বাবুকে তো আমাদের কেরাণী-নারায়ণ বলবার ইচ্ছাও হয় না, যদিও ধর্ম্মতত্ত্বে ব'লে থাকে সকল নরের মধ্যেই নারায়ণের আবির্ভাব আছে। তাহোলেই বোঝা যাচ্চে আপিসের বড়ো বাবুর মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা নেই—কিন্তু যেখানে তাঁর গৃহিণী সাধ্বী সেখানে তাঁর মধ্যে আছে। তাই ব'লে এমন কথা বলা যায় না, যে, ঐ বাবুটিকেই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি আর মা'লক্ষ্মীকে বুঝিনে—বরঞ্চ উল্টো। কেবল কথা এই, যে, বোঝবার বেলায় মালক্ষ্মী যত সহজ বোঝাবার বেলায় তত নয়।

"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" ব্যাপারটা ঘটনা হিসাবে সহজ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির

কাছে তৃতীয় ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করেছে। এমন কাণ্ড দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার ঘটে। এইটুকু বলবার জন্মে কথাকে বেশি নাড়া দেবার দরকার হয় না। কিন্তু নাম কানের ভিতর দিয়ে যখন মরমে গিয়ে পশে—অর্থাৎ এমন জায়গায় কাজ করতে থাকে যে-জায়গা দেখা-শোনার অতীত, এবং এমন কাজ করতে থাকে যাকে মাপা যায় না, ওজন করা যায় না, চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে যার সাক্ষ্য নেওয়া যায় না, তখন কথাগুলোকে নাড়া দিয়ে তাদের পুরো অর্থের চেয়ে তাদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আদায় ক'রে নিতে হয়। অর্থাৎ আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম্ম হচ্চে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে।

এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই তো আলোকের রং বদল হচ্চে, শব্দের সুর বদল হচ্চে, এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে। এমন কি সৃষ্টির বাইরের পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরের রহস্য-নিকেতনে

যতই প্রবেশ করা যায় ততই বস্তুত্ব ঘুচে গিয়ে কেবল বেগই প্রকাশ পেতে থাকে। শেষকালে এই কথাই মনে হয় প্রকাশ-বৈচিত্র্যের মূলে বুঝি এই বেগবৈচিত্র্য। যদিদং সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।

মানুষের সত্তার মধ্যে এই অনুভূতিলোকই হচ্চে সেই রহস্যলোক যেখানে বাহিরের রূপজগতের সমস্ত বেগ অন্তরে আবেগ হয়ে উঠ্ছে, এবং সেই অন্তরের আবেগ আবার বাহিরে রূপ গ্রহণ করবার জন্যে উৎসুক হচ্চে। এই জন্যে বাক্য যখন আমাদের অনুভূতিলোকের বাহনের কাজে ভর্ত্তি হয় তখন তার গতি না হোলে চলে না। সে তার অর্থের দ্বারা বাহিরের ঘটনাকে ব্যক্ত করে, গতির দ্বারা অন্তরের গতিকে প্রকাশ করে।

শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে-একটা অদৃশ্য বেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হোলো তাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে এই কথাটাকে তুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থাম্‌বে না। "সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" কেবলি ঢেউ উঠ্‌তে লাগল। ঐ ক'টি কথা

ছাপার অক্ষরে যদিও ভালো মানুষের মতো দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে কিন্তু ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।

আমাদের পুরাণে ছন্দের উৎপত্তির কথা যা বলেছে তা সবাই জানেন। দুটি পাখীর মধ্যে একটিকে যখন ব্যাধ মারলে তখন বাল্মীকি মনে যে-ব্যথা পেলেন সেই ব্যথাকে শ্লোক দিয়ে না জানিয়ে তাঁর উপায় ছিল না। যে-পাখীটা মারা গেল এবং আর যে-একটি পাখী তার জন্যে কাঁদল তারা কোনকালে লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এই নিদারুণতার ব্যথাটিকে তো কেবল কালের মাপকাঠি দিয়ে মাপা যায় না। সে যে অনন্তের বুকে বেজে রইল। সেই জন্যে কবির শাপ ছন্দের বাহনকে নিয়ে কাল থেকে কালান্তরে ছুটতে চাইলে। হায়রে, আজও সেই ব্যাধ নানা অস্ত্র হাতে নানা বীভৎসতার মধ্যে নানা দেশে নানা আকারে ঘুরে বেড়াচ্চে। কিন্তু সেই আদিকবির শাপ শাশ্বত-কালের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে রইল। এই শাশ্বত-কালের কথাকে প্রকাশ করবার জন্যেই তো ছন্দ।

আমরা ভাষায় ব'লে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা।

কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্চে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্ম্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।

গোড়াতেই ছন্দ সম্বন্ধে এতখানি ওকালতি করা হয় তো বাহুল্য ব'লে অনেকের মনে হোতে পারে। কিন্তু আমি জানি এমন লোক আছেন যাঁরা ছন্দকে সাহিত্যের একটা কৃত্রিম প্রথা ব'লে মনে করেন। তাই আমাকে এই গোড়ার কথাটা বুঝিয়ে বল্‌তে হোলো যে, পৃথিবী ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার ঘূর্ণিলয়ে তিনশো পঁয়ষট্টি মাত্রার ছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেও যেমন কৃত্রিম নয়, ভাবাবেগ তেমনি ছন্দকে আশ্রয় ক'রে আপন গতিকে প্রকাশ করবার যে চেষ্টা করে সেও তেমনি কৃত্রিম নয়।

এইখানে কাব্যের সঙ্গে গানের তুলনা ক'রে আলোচ্য বিষয়টাকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক্‌।

সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে

আপনি স্পন্দিত হচ্চে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়—সে আপনাকে আপনিই প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনি-বেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতি-বেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র—তার যেন কোনো অবলম্বন নেই। সাধারণত সংসারে আমরা কতকগুলি বিশেষ ঘটনা আশ্রয় ক'রে সুখে দুঃখে বিচলিত হই। সেই ঘটনা সত্যও হোতে পারে, কাল্পনিকও হোতে পারে অর্থাৎ আমাদের কাছে সত্যের মতো প্রতিভাত হোতে পারে। তারই আঘাতে আমাদের চেতনা নানা রকমে নাড়া পায়—সেই নাড়ার প্রকার-ভেদে আমাদের আবেগের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। কিন্তু গানের সুরে আমাদের চেতনাকে যে-নাড়া দেয় সে কোনো ঘটনার উপলক্ষ্য দিয়ে নয়, সে একেবারে অব্যবহিত-ভাবে। সুতরাং তাতে যে আবেগ উৎপন্ন হয় সে অহৈতুক আবেগ। তাতে আমাদের চিত্ত নিজের স্পন্দন-বেগেই নিজেকে জানে—বাইরের সঙ্গে কোনো ব্যবহারের যোগে নয়।

সংসারে আমাদের জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তার সঙ্গে নানা দায় জড়ানো আছে। জৈবিক দায়, বৈষয়িক দায়, সামাজিক দায়, নৈতিক দায়। তার জন্যে নানা চিন্তায় নানা কাজে আমাদের চিত্তকে বাইরে বিক্ষিপ্ত করতে হয়। শিল্পকলায়, কাব্যে এবং রস-সাহিত্য মাত্রেই আমাদের চিত্তকে সেই সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দেয়। তখন আমাদের চিত্ত সুখ দুঃখের মধ্যে আপনারই বিশুদ্ধ প্রকাশ দেখতে পায়। সেই প্রকাশই আনন্দ। এই প্রকাশকে আমরা চিরন্তন বলি এই জন্যে, যে, বাইরের ঘটনাগুলি সংসারের জাল বুনতে বুনতে নানা প্রয়োজন সাধন করতে করতে সরে যায় চলে যায়, তাদের নিজের মধ্যে নিজের কোনো চরম মূল্য নেই। কিন্তু আমাদের চিত্তের যে আত্মপ্রকাশ তার আপনাতেই আপনার চরম—তার মূল্য তার আপনার মধ্যেই পর্য্যাপ্ত। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চ-বিরহিণীর দুঃখ কোনোখানেই নেই কিন্তু আমাদের চিত্তের আত্মানুভূতির মধ্যে সেই বেদনার তার বাঁধা হয়েই আছে—সে ঘটনা এখন ঘট্‌ছে না, বা সে ঘটনা কোনো কালেই ঘটে নি এ কথা তার কাছে প্রমাণ ক'রে কোনো লাভ নেই।

যাহোক্, দেখা যাচ্চে, গানের স্পন্দন আমাদের চিত্তের মধ্যে যে আবেগ জন্মিয়ে দেয়, সে কোনো সাংসারিক ঘটনামূলক আবেগ নয়। তাই মনে হয় সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে-একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। এতে ক'রে আমাদের চেতনা দেশকালের সীমা পার হয়ে নিজের চঞ্চল প্রাণধারাকে বিরাটের মধ্যে উপলব্ধি করে।

কাব্যেও আমরা আমাদের চিত্তের এই আত্মানুভূতিকে বিশুদ্ধ এবং মুক্তভাবে অথচ বিচিত্র আকারে পেতে চাই। কিন্তু কাব্যের প্রধান উপকরণ হোলো কথা। সে তো সুরের মতো স্বপ্রকাশ নয়। কথা অর্থকে জানাচ্চে। অতএব কাব্যে এই অর্থকে নিয়ে কারবার করতেই হবে। তাই গোড়ায় দরকার এই অর্থটা যেন রসমূলক হয়। অর্থাৎ সেটা এমন কিছু হয় যা স্বতই আমাদের মনে স্পন্দন সঞ্চার করে, যাকে আমরা বলি আবেগ।

কিন্তু যেহেতু কথা জিনিষটা স্বপ্রকাশ নয় এই

জন্যে সুরের মতো কথার সঙ্গে আমাদের চিত্তের সাধর্ম্ম্য নেই। আমাদের চিত্ত বেগবান, কিন্তু কথা স্থির। এ প্রবন্ধের আরম্ভেই আমরা এই বিষয়টার আলোচনা করেছি। বলেছি, কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের চিত্তের সামগ্রী করে তোলবার জন্যে ছন্দের দরকার। এই ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে তা নয়, তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।

এই স্পন্দনের যোগে শব্দের অর্থ যে কী অপরূপতা লাভ করে তা আগে থাক্‌তে হিসাব করে বলা যায় না। সেই জন্যে কাব্যরচনা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। তার বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্চে বিষয়কে অতিক্রম করা; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্চে অনির্ব্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্যথেকে সেই অনির্ব্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

"রজনী সাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।"

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্চে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুল্‌তেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় ক'রে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল—এমন কি, জর্ম্মন কাইজার আজ যে চার বছর ধ'রে এমন দুর্দ্দান্ত প্রতাপে লড়াই করছে সেও এর তুলনায় তুচ্ছ এবং অনিত্য। ঐ লড়াইয়ের তথ্যটাকে এক দিন বহুকষ্টে ইতিহাসের বই থেকে মুখস্থ ক'রে ছেলেদের একজামিন পাস করতে হবে—কিন্তু পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে—এ পড়া-মুখস্থ করার জিনিস নয়। এ আমরা আপনার প্রাণের মধ্যে দেখতে পাব, এবং যা দেখব সেটা একটি মেয়ের বিছানায় শুয়ে ঘুমোনোর চেয়ে অনেক বেশি। এই কথাটাকেই আরেক ছন্দে লিখলে বিষয়টা ঠিকই থাক্‌বে। কিন্তু বিষয়ের চেয়ে বেশি যেটা, তার অনেকখানি বদল হবে।

শ্রাবণ মেঘে তিমির-ঘন শর্ব্বরী,
বরিষে জল কানন-তলে মর্ম্মরি' ॥

জলদরব-ঝঙ্কারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম সুখ-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি'॥

এই ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুট্‌ল না। এ আর-এক জিনিষ হোলো।

ছন্দ কবিতার বিষয়টির চারদিকে আবর্ত্তন করছে। পাতা যেমন গাছের ডাঁটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে তাল রেখে ওঠে এও সেই রকম। গাছের বস্তু-পদার্থ তার ডালের মধ্যে গুঁড়ির মধ্যে মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার লাবণ্য, তার চাঞ্চল্য, বাতাসের সঙ্গে তার আলাপ, আকাশের সঙ্গে তার চাউনির বদল এসমস্ত প্রধানত তার পাতার ছন্দে।

পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির মতো কাব্যে ছন্দের আবর্ত্তনের দুটি অঙ্গ আছে, একটি বড়ো গতি আর একটি ছোটো গতি। অর্থাৎ চাল এবং চলন। প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। দৃষ্টান্ত দেখাই।

"শারদচন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ"

এরই প্রত্যেকটি হোলো চলন। এমন আটটি চলনে এই

ছন্দের চাল সারা হচ্চে। অর্থাৎ ছয়ের মাত্রায় এ পা ফেল্‌ছে এবং আটের মাত্রায় ঘুরে আস্‌ছে। "শারদ চন্দ্র" এই কথাটি ছয় মাত্রার, "শারদ" তিন এবং "চন্দ্র"ও তিন। বলা বাহুল্য, যুক্ত অক্ষরে দুই অক্ষরের মাত্রা আছে, এই কারণে "শারদ চন্দ্র" এবং "বিপিন ভরল" ওজনে একই।

১ ২ ৩ ৪
শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিন ভরল কুসুম গন্ধ,
৫ ৬ ৭ ৮
ফুল্ল মল্লি, মালতি যূথি, মত্ত মধুপ ভোরণী।

প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার 'পরেই ছন্দের বিশেষত্ব বেশি নির্ভর করছে। কেননা এই আট পদক্ষেপের আবর্ত্তন সকল ছন্দেই চলে। বস্তুত এইটেই হচ্চে অধিকাংশ ছন্দের চলিত কায়দা। যথা,

১ ২ ৩ ৪
মহাভার- তের কথা অমৃত স- মান
৫ ৬ ৭ ৮
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্য- বান।

এও আট পদক্ষেপ।

এই জাত নির্ণয় করতে হোলে চালের দিকে ততটা নয় কিন্তু চলনের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। দিলে দেখা যাবে, ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সম-চলনের ছন্দ, অসম-চলনের ছন্দ এবং বিষম-চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সম-মাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসম মাত্রার চলন এবং দুই তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষম মাত্রার ছন্দ।

ফিরে ফিরে আঁখি- নীরে পিছু পানে চায়।
পায়ে পায়ে বাধা গ'ড়ে চলা হোলো দায়।

এ হোলো দুই মাত্রার চলন। দুইয়ের গুণফল চার বা আটকেও আমরা এক জাতিরই গণ্য করি।

নয়ন ধারায় পথ সে হারায়, চায় সে পিছন পানে,
চলিতে চলিতে চরণ চলে না, ব্যথার বিষম টানে।

এ হোলো তিন মাত্রার চলন। আর

যতই চলে চোখের জলে নয়ন ভরে ওঠে,
চরণ বাধে, পরাণ কাঁদে, পিছনে মন ছোটে।

এ হোলো দুই তিনের যোগে বিষম মাত্রার ছন্দ।

তা হোলেই দেখতে পাওয়া যাচ্চে চলনের ভেদেই ছন্দের প্রকৃতি ভেদ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে। কিন্তু দেখা যায় তার লীলাবৈচিত্র্য সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রা অবলম্বন ক'রেই প্রধানত প্রকাশ পেয়েছে। প্রাকৃত বাংলায় যত কবিতা আছে তার ছন্দ সংখ্যা বেশি নয়। সম মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত :—

কেন তোরে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি।

এ ছাড়া পয়ার এবং ত্রিপদী আছে—সেও সম মাত্রার ছন্দ।

অসম মাত্রার অর্থাৎ তিনের ছন্দ চার রকমের পাওয়া যায়—

১। মলিন বদন ভেল,
ধীরে ধীরে চলি গেল।
আগুন বাহির পাশ।
কি কহিব জ্ঞান দাস।

২। জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন
অসিত চাঁদের উদয় দিন ॥

৩। সবাই যেথানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা।

৪। বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে ॥

বিষম মাত্রার দৃষ্টান্ত কেবল একটা চোখে পড়েছে—সেও কেবল গানের আরম্ভে—শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে নি।

চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়নে চায় ॥

বাংলায় সম মাত্রার ছন্দের মধ্যে পয়ার এবং ত্রিপদীই সব চেয়ে প্রচলিত। এই দুটি ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামত ঢালাচালি করতে পারেন।

"পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।"

এর মধ্যে কতটা ফাঁক আছে তা যুক্তাক্ষর বসালেই টের পাওয়া যায়।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় গায়ের বাতাসে।"

ভারি হোলো না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের বাতাসে।"

এতেও বিশেষ ভিড় বাড়ল না।

"পাষাণ মূর্চ্ছিয়া যায় অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এও বেশ সহ্য হয়।

"সঙ্গীত তরঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছ্বাসে।"

এতেও অত্যন্ত ঠেসাঠেসি হোলো না।

"সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গ অঙ্গের উচ্ছ্বাস।"

অনুপ্রাসের ভিড় হোলো বটে কিন্তু এখনো অন্ধকূপ হত্যা হবার মতো হয় নি। কিন্তু এর বেশি আর সাহস হয় না তবু যদি আরো প্যাসেঞ্জার নেওয়া যায় তাহোলে যে একেবারে পয়ারের নৌকাডুবি হবে তা নয়, তবে কিনা হাঁপ ধরবে—যথা,

দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত।

কিন্তু দুই মাত্রার ছন্দ মাত্রেরই যে এই রকম

অসাধারণ শোষণশক্তি তা বলতে পারিনে। যেখানে পদক্ষেপ ঘন ঘন সেখানে ঠিক উল্টো। যথা—

২ ২   ২ ২   ২ ২   ২
ধরণীর   আঁখিনীর   মোচনের   ছলে,
২ ১   ১ ২   ২ ২   ২
দেবতার   অবতার   বসুধার   তলে।

এও পয়ার কিন্তু যেহেতু এর পদক্ষেপ আটে নয়, দুইয়ে, সেইজন্যে এর উপরে বোঝা সয় না। যে দ্রুত চলে তাকে হাল্কা হোতে হয়। যদি লেখা যায়,

ধরিত্রীর চক্ষুনীর মুঞ্চনের ছলে,
কংসারির শঙ্খ-রব সংসারের তলে—

তাহোলে ও একটা স্বতন্ত্র ছন্দ হয়ে যায়। সংস্কৃতেও দেখো, সম মাত্রার ছন্দ যেখানে দুয়ের লয়ে চলে সেখানে দৌড় বেশি—যেমন—

২   ১   ১ ২   ২ ২ ২ ২
হরি   রিহ   বিহরতি   সরস বসন্তে।

অসম অর্থাৎ তিন মাত্রার চলনও দ্রুত।

পাষাণ   মিলায়   গায়ের   বাতাসে—

এর লয়টা দুরন্ত। পড়লেই বোঝা যায় এর প্রত্যেক তিন মাত্রা পরবর্ত্তী তিন মাত্রাকে চাচ্চে,

কিছুতে তর সচে না। তিনের মাত্রাটা টলটলে—গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক। এইজন্যে তিনকে গুণ ক'রে ছয় বা বারো করলেও তার চাপল্য ঘোচে না। দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর। তিন মাত্রার ছন্দে যে পয়ারের মতো ফাঁক নেই তা যুক্তাক্ষর জুড়তে গেলেই ধরা পড়বে। যথা—

গিরির গুহার ঝরিছে নির্ঝর

এই পদটিকে যদি লেখা যায়

পর্ব্বত কন্দরে ঝরিছে নির্ঝর

তাহোলে ছন্দের পক্ষে সাংঘাতিক হয়। অথচ পয়ারে

গিরি গুহাতল বেয়ে ঝরিছে নির্ঝর

এবং

পর্ব্বত কন্দর তলে ঝরিছে নির্ঝর

ছন্দের পক্ষে দুইই সমান।

বিষম মাত্রার ছন্দের স্বভাব হচ্চে তার প্রত্যেক পদে এক অংশে গতি, আর এক অংশে বাধা। এই গতি এবং বাধার সম্মিলনে তার নৃত্য।

"অহহ কল- য়ামি বল- য়াদি মণি ভূষণং
হরি বিরহ দহন বহ- নেন বহু দষণং।"

তিন মাত্রার "অহহ" যে ছাঁদে চলবার জন্যে বেগ সঞ্চয় করলে, দুই মাত্রার "কল" তাকে হঠাৎ টেনে থামিয়ে দিলে— আবার পরক্ষণেই তিন যেই নিজমূর্ত্তি ধরলে অমনি আবার দুই এসে তা'র লাগামে টান দিলে। এই বাধা যদি সত্যকার বাধা হোত, তাহোলে ছন্দই হোত না—এ কেবল বাধার ছল, এতে গতিকে আরো উস্কিয়ে দেয় এবং বিচিত্র ক'রে তোলে। এইজন্যে অন্য ছন্দের চেয়ে বিষম মাত্রার ছন্দে গতিকে আরো যেন বেশি অনুভব করা যায়।

যাই হোক্ আমার বক্তব্য এই, ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্চে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্চে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা ক'রে ব'লে থাকি যে, এটা চোদ্দো মাত্রার ছন্দ, বা ওটা দশ মাত্রার তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না—চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়। চোদ্দো মাত্রায় শুধু যে পয়ার হয় না, আরো অনেক ছন্দ হয় তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

বসন্ত পাঠায় দূত রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তারি নিশ্বাস বহিয়া।

এই তো পয়ার—এর প্রত্যেক প্রদক্ষিণে ছুটি পদক্ষেপ। প্রথম পদক্ষেপে আটটি উচ্চারিত মাত্রা, দ্বিতীয় পদক্ষেপে ছয়টি উচ্চারিত মাত্রা এবং ছুটি অনুচ্চারিত অর্থাৎ যতির মাত্রা। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদক্ষিণে মোটের উপর উচ্চারিত মাত্রা চোদ্দো। আমরা পয়ারের পরিচয় দেওযার কালে প্রত্যেক প্রদক্ষিণের উচ্চারিত মাত্রার সমষ্টির হিসাব দিয়ে থাকি। তার প্রধান কারণ, কিছুকাল পূর্ব্বে পয়ার ছাড়া চোদ্দো মাত্রা-সমষ্টির ছন্দ আমাদের ব্যবহারে লাগত না। নিম্নলিখিত চোদ্দো মাত্রার ছন্দেও ঠিক পয়ারের মতোই প্রত্যেক প্রদক্ষিণে ছুটি ক'রে পদক্ষেপ :—

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,
পরাণ ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

অথচ এটা মোটেই পয়ার নয়। তফাৎ হোলো কিসে,—যাচাই ক'রে দেখলে দেখা যাবে যে এর প্রতি পদক্ষেপে আটের বদলে সাত উচ্চারিত মাত্রা। আর

অনুচ্চারিত মাত্রা প্রতি পদক্ষেপের শেষে একটি ক'রে দেওয়া যেতে পারে—যেমন,

"ফাগুন এল দ্বারে-এ কেহ যে ঘরে না-আ-ই।"

কিম্বা কেবল শেষ ছেদে একটি দেওয়া যেতে পারে, যেমন, "ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে না-আ-ই।" কিম্বা যতি একেবারেই না দেওয়া যেতে পারে।

পুনশ্চ এই ছন্দেরই মাত্রাসমষ্টি সমান রেখে এরই পদক্ষেপমাত্রার পরিবর্ত্তন ক'রে যদি পড়া যায় তাহোলে শ্লোকটি চোখে দেখতে একই রকম থাকবে কিন্তু কানে শুনতে অন্য রকম হবে। এইখানে ব'লে রাখি, ছন্দের প্রত্যেক ভাগে একটা ক'রে তালি দিলে পড়বার সুবিধা হবে এবং এই তালি অনুসারে ভিন্ন ছন্দের ভিন্ন লয় ধরা পড়বে। প্রথমে সাত মাত্রাকে তিন এবং চারে স্বতন্ত্র ভাগ ক'রে পড়া যাক্—যেমন,

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন	এল দ্বারে	কেহ যে	ঘরে নাই,
পরাণ	ডাকে কারে	ভাবিয়া	নাহি পাই।

তারপরে পাঁচ দুই ভাগ করা যাক্ যেমন,—

তালি	তালি	তালি	তালি
ফাগুন এল	দ্বারে	কেহ যে ঘরে	নাই,
পরাণ ডাকে	কারে	ভাবিয়া নাহি	পাই।

এই চোদ্দো মাত্রাসমষ্টির ছন্দ আরো কত রকম হোতে পারে তার কতকগুলি নমুনা দেওয়া যাক্ ঃ—
দুই পাঁচ দুই পাঁচ ভাগের ছন্দ—যথা—

| | | |

সে যে আপন মনে শুধু দিবস গণে
তার চোখের বারি কাঁপে আঁখির কোণে।

চার তিন চার তিন ভাগ—

| | | |

নয়নের সলিলে যে কথাটি বলিলে
র'বে তাহা স্মরণে জীবনে ও মরণে।

কিম্বা এক ছয় এক ছয় ভাগ—

| | | |

যে কথা নাহি শোনে সে থাক্ নিজমনে
কে বৃথা নিবেদনে সে ফিরে তার সনে।

সাত চার তিনের ভাগ—

| | |

চাহিছ বারে বারে আপনারে ঢাকিতে,
মন না মানে মানা মেলে ডানা আঁখিতে।

* এই প্রত্যেক দণ্ডচিহ্নের অনুসরণ ক'রে তাল দেওয়া আবশ্যক।

এই কবিতাটাকেই অন্য লয়ে পড়া যায়—

।   ।   ।   ।

চাহিছ   বারে বারে   আপনারে   ঢাকিতে,

মন না   মানে মানা   মেলে ডানা   আঁখিতে।

তিন তিন তিন তিন দুইয়ের ভাগ—

।   ।   ।   ।   ।

ব্যাকুল   বকুল   ঝরিল   পড়িল   ঘাসে,

বাতাস   উদাস   আমের   বোলের   বাসে।

এ'কেই ছয় আটের ভাগে পড়া যায়—

।   ।

ব্যাকুল বকুল   ঝরিল পড়িল ঘাসে।

বাতাস উদাস   আমের বোলের বাসে॥

পাঁচ চার পাঁচের ভাগ—

।   ।   ।

নীরবে গেলে   ম্লান-মুখে   আঁচল টানি',

কাঁদিছে দুখে   মোর বুকে   না-বলা বাণী।

এই শ্লোককেই তিন ছয় পাঁচ ভাগ করা যায়—

।   ।   ।

নীরবে   গেলে ম্লান-মুখে   আঁচল টানি'

কাঁদিছে   দুখে মোর বুকে   না-বলা বাণী।

এর থেকে এই বোঝা যাচ্ছে, প্রদক্ষিণের সমষ্টি

মাত্রা চোদ্দো হোলেও সেই সমষ্টির অংশের হিসাব কে কী ভাবে নিকাস করছে তারই উপর ছন্দের প্রভেদ ধরা পড়ে। কেবল ছন্দ-রসায়নে নয়, বস্তু-রসায়নেও এই রকম উপাদানের মাত্রা ভাগ নিয়েই বস্তুর প্রকৃতি-ভেদ ঘটে রাসায়নিকেরা বোধ করি এই কথা বলেন।

পয়ার ছন্দের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। যথা,—

ওহে পান্থ, চলো পথে, পথে বন্ধু আছে
একা ব'সে ম্লান-মুখে, সে যে সঙ্গ যাচে।

"ওহে পান্থ"—এইখানে একটা থামবার ষ্টেশন মেলে। তারপরে যথাক্রমে, "ওহে পান্থ চলো",—"ওহে পান্থ চলো পথে", "ওহে পান্থ চলো পথে পথে।" তারপরে "বন্ধু আছে" এই ভগ্নাংশটার সঙ্গে পরের লাইন জোড়া যায়—যেমন, "বন্ধু আছে একা", "বন্ধু আছে একা ব'সে", "বন্ধু আছে একা ব'সে সে যে।" কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এই জন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামতো থামা চলে না। যেমন, "নিশি দিল ডুব অরুণ সাগরে।" "নিশি দিল", এখানে থামা যায়—কিন্তু তাহোলে তিনের ছন্দ ভেঙে

যায়—"নিশি দিল ডুব" পর্য্যন্ত এসে ছয় মাত্রা পূরিয়ে দিয়ে তবেই তিনের ছন্দ হাঁফ ছাড়তে পারে। কিন্তু আবার, "নিশি দিল ডুব অরুণ" এখানেও থামা যায় না, কেননা, তিন এমন একটি মাত্রা, যা আর একটা তিনকে পেলে তবে দাঁড়াতে পারে, নইলে ট'লে পড়তে চায়—এই জন্য "অরুণ-সাগর"-এর মাঝখানে থাম্‌তে গেলে বসনা কূল পায় না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্য প্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য্য এবং প্রসারতা অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়—সে যেন চাকা নিয়ে লাঠি খেলার চেষ্টা। পয়ার আট পায়ে চলে ব'লে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ-কাব্যে তার প্রমাণ আছে। তার অবতারণাটি পরখ ক'রে দেখা যাক্। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ো নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেন নি। প্রথম আরম্ভেই বীরবাহুর বীরমর্য্যাদা সুগম্ভীর হয়ে বাজ্‌ল—"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু" তার পরে তার অকাল মৃত্যুর

সংবাদটি যেন ভাঙা রণ-পতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল—"চলি যবে গেলা যমপুরে অকালে"—তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমস্কার করলে, "কহ হে দেবি অমৃত-ভাষিণি" তার পরে আসল কথাটা, যেটা সব চেয়ে বড়ো কথা—সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা সূচনা, সেটা যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ-গর্জ্জনের মতো এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্তে উদ্‌ঘোষিত হোলো—"কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে পাঠাইলা রণে পুন রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।"

বাংলা ভাষায় অধিকাংশ শব্দই দুই মাত্রার এবং তিন মাত্রার, এবং ত্রৈমাত্রিক শব্দের উপর বিভক্তি যোগে চার মাত্রার। পয়ারের পদ-বিভাগটি এমন যে, দুই, তিন এবং চার মাত্রার শব্দ তাতে সহজেই জায়গা পায়।

> চৈত্রের সেতারে বাজে বসন্ত বাহার,
> বাতাসে বাতাসে ওঠে তরঙ্গ তাহার।

এ পয়ারে তিন অক্ষরের ভিড়। আবার

> চক-মকি ঠোকাঠুকি-আগুনের প্রায়,
> চোখোচোখি ঘটিতেই হাসি ঠিকরায়।

এই পয়ারে চারের প্রাধান্য।

তারাগুলি সারারাতি কানে কানে কয়।
সেই কথা ফুলে ফুলে ফুটে বনময়।

এই খানে দুই মাত্রার আয়োজন।

প্রেমের অমরাবতী প্রেয়সীর প্রাণে,
কে সেথা দেবাধিপতি সে কথা কে জানে।

এই পয়ারে এক থেকে পাঁচ পর্য্যন্ত সকল রকম মাত্রারই সমাবেশ। এর থেকে জানা যায় পয়ারের আতিথেয়তা খুব বেশি আর সেই জন্যেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রথম থেকেই পয়ারের এত অধিক চলন।

পয়ারের চেয়ে লম্বা দৌড়ের সমমাত্রার ছন্দ আজকাল বাংলাকাব্যে চলছে। স্বপ্ন-প্রয়াণে এর প্রথম প্রবর্ত্তন দেখা গেছে। স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই তার নমুনা তুলে দেখাই—

গম্ভীর পাতাল, যেথা কালরাত্রি করাল বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণিফণা
দিবানিশি ফাটি' রোষে; ঘোর-নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল।

উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত মাত্রা নিয়ে পয়ার যেমন

আট পদমাত্রায় সমান দুই ভাগে বিভক্ত এ তা নয়। এর একভাগে উচ্চারিত মাত্রা আট, অন্যভাগে উচ্চারিত মাত্রা দশ। এই রকম অসমান ভাগে ছন্দের গাম্ভীর্য্য বাড়ে। ছন্দে পদে পদে ঠিক সমান ওজন দাবি করা কানের যেন একটা বাঁধা মৌতাতের মতো দাঁড়ায়, সেইটি ভেঙে দিলে ছন্দের গৌরব আরো বাড়ে। সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার অসমান ভাগের গাম্ভীর্য্য সবাই জানেন—

কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ

এর প্রথম ভাগে আট, দ্বিতীয় ভাগে সাত, তৃতীয় ভাগে সাত, এবং চতুর্থ ভাগে চার মাত্রা। এমনতরো ভাগে কানের কোনো সঙ্কীর্ণ অভ্যাস হবার জো নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে সাধু বাংলা সাহিত্যের ছন্দের যে-একটি বিশেষ প্রভেদ আছে সেইটির কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। সংস্কৃত উচ্চারণের বিশেষত্ব হচ্চে তার ধ্বনির দীর্ঘ হ্রস্বতা। সেইজন্য সংস্কৃত ছন্দ কেবলমাত্র পদক্ষেপের মাত্রা গণনা ক'রেই নিশ্চিন্ত থাকে না, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব মাত্রাকে সাজানো তার ছন্দের অঙ্গ। আমি একটি বাংলা বই থেকে এর দৃষ্টান্ত তুলছি। বইটির নাম "ছন্দঃ কুসুম"।

আজ চুয়াম্ন বছর পূর্ব্বের এটি রচনা। লেখক ভুবন-মোহন রায় চৌধুরী রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছন্দ শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণবিরহিণী রাধা কালো রংটারই দূষণীয়তা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে যখন কালো কোকিল কালো ভ্রমর কালো পাথর কালো লোহার নিন্দা করলেন তখন অপর পক্ষের উকীল লোহার দোষ ক্ষালন করতে প্রবৃত্ত হলেন—

॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥ । ।
দেখহ সুন্দর লোহ রথে চড়ি লো হ প থে ক ত লো ক চ লে
ষষ্ঠ মু হূর্ত্তক ম ধ্য করে গ তি যোজন পঞ্চদশের পথে।
লোহ-বিনির্ম্মিত তার তবে বহুদূর অবস্থিত লোক সবে
দূর অবস্থিত বন্ধুসনে সুখচিত্ত পরস্পর বাক্য কহে।

এই কবিতাটির যুক্তি ও আধ্যাত্মিক রসমাধুর্য্যের বিচার ভার আধুনিক কালের বস্তুতান্ত্রিক উকীল রসিকদের উপর অর্পণ করা গেল—তা ছাড়া লোক-শিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার তর্ক তোলবার অধিকারীও আমি নই। আমি ছন্দের দিক দিয়ে বল্‌ছি—এর প্রত্যেক পদভাগে একটি দীর্ঘ ও দুইটি হ্রস্ব মাত্রা—সেই দীর্ঘ হ্রস্বের ওঠা-পড়ার পর্য্যায়ই হচ্চে এই ছন্দের

প্রকৃতি। বাংলায় স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা নাই কিম্বা নাই বললেই হয় এবং যুক্ত ব্যঞ্জনকে সাধু বাংলা কোনো গৌরব দেয় না—অযুক্তের সঙ্গে একই বাট্‌খারায় তা'র ওজন চলে। অতএব মাত্রা সংখ্যা মিলিয়ে ঐ লোহার স্তব যদি বাংলা ছন্দে লেখা যায় তাহোলে তার দশা হয় এই :—

দেখ দেখ মনোহর লোহার গা- ড়িতে চড়ি
লোহা পথে কত শত মানুষ চ- লিছে।
দেখিতে দে- খিতে তারা যোজন যো- জন পথ
অনায়াসে চলে যায় টিকিট কি- নিয়া
যে সব মানুষ আছে অনেক দূরের দেশে
লোহা দিয়ে গড়া তার রয়েছে বলিয়া
সুদূর বঁধুর সাথে কত যে মনের সুখে
কথা চালাচালি করে নিমেষে নিমেষে।

বাংলায় আর সবই রইল—মাত্রাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয়নি—কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তরিয়ে দেয় এবং বঁধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থাক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হোতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্চে—কিন্তু মূল ছন্দের

প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায়নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া। তাতে জমি পাওয়া গেল কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না। অথচ ঢেউটা ছন্দের একটা প্রধান জিনিস। সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল ক'রে দিয়েছে। এ হচ্চে কাজকে সহজ কর্‌বার একটা কৃত্রিম বাঁধা নিয়ম। আমরা যখন বলি থার্ডক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড-ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা ব'লে ধ'রে নিই তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউবা তার নিচে নামে। ভালো শিক্ষা-প্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়—থার্ড-ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমান ভাবে আরোপ না করা যায়। কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী কর্‌বার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই হোক্ হসন্তই হোক্ আর যুক্তবর্ণই হোক এই ছন্দে সকলেরই সমান মাত্রা।

অথচ প্রাকৃত বাংলার প্রকৃতি সমতল নয়। সংস্কৃতের নিয়মে না হোক নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউ খেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয়। বস্তুতঃ পদে পদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে। তার কারণ, প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে—সেই সংঘাতে ধ্বনি গুরু হয়ে ওঠে। প্রাকৃত বাংলার এই গুরুধ্বনির প্রতি যদি সদ্ব্যবহার করা যায় তাহোলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত বাংলার দৃষ্টান্ত :—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয়্ এল বান,
শিব্ ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন্ কন্যে দান্।
এক কন্যে রাঁধেন্ বাড়েন্ এক কন্যে খান্,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের্ বাড়ি যান্।

এই ছড়াটিতে দুটি জিনিষ দেখবার আছে। এক হচ্চে বিসর্গের ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন—আর এক হচ্চে "বৃষ্টি" এবং "কন্যে" কথার যুক্ত বর্ণকে যথোচিত মর্য্যাদা দেওয়া। এই ছড়া সাধু

বাংলার ছন্দে বাঁধলে পালিস করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে।

বারি ঝরে ঝর ঝর নদিয়ায় বান
শিবুঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান।
এক মেয়ে রাঁধিছেন এক মেয়ে খান,
এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান।

এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হোলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না। যথা—

মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে, নবদ্বীপে বান,
শিবুঠাকুরের বিবাহ তিন কন্যা দান।
এক কন্যা রন্ধিছেন, এক কন্যা খান,
এক কন্যা ঊর্ধ্বশ্বাসে পিতৃগৃহে যান।

এই সব যুক্ত বর্ণের যোগে এ ছন্দ বন্ধুর হয়ে উঠেছে বটে কিন্তু তরঙ্গিত হয়নি—কেননা যুক্তবর্ণ যথেচ্ছ ছড়ানো হয়েছে মাত্র, তাদের মর্য্যাদা অনুসারে জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ হাটের মধ্যে ছোটোয় বড়োয় যেমন গায়ে গায়ে ভিড় করে তেমনি, সভার মধ্যে যেমন তারা যথাযোগ্য আসন পায় তেমন নয়।

"ছন্দঃকুসুম" বইটির লেখক প্রাকৃত বাংলার ছন্দ সম্বন্ধে অনুষ্টুভ ছন্দে বিলাপ ক'রে বল্‌ছেন—

> পাঁচালী নাম বিখ্যাতা, সাধারণ মনোরমা
> পয়ার ত্রিপদা আদি প্রাকৃতে হয় চালনা।
> দ্বিপাদে শ্লোক সম্পূর্ণ তুল্যসংখ্যার অক্ষরে,
> পাঠে দুই পদে মাত্র শেষাক্ষর সদা মিলে।
> পঠনে সে সব চ্ছন্দঃ রাখিতে তাল গৌরব
> পঠিছে সর্ব্বদা লোকে উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে।
> লঘুকে গুরু সম্ভাষে দীর্ঘবর্ণে কহে লঘু,
> হ্রস্বে দীর্ঘে সমজ্ঞানে উচ্চারণ করে সবে।

কবির এই বিলাপের সঙ্গে আমিও যোগ দিচ্চি। কেবল আমি এই বল্‌তে চাই প্রাকৃত বাংলার ছন্দে এমনতরো দুর্ঘটনা ঘটে না, এ সব ঘটে সংস্কৃত বাংলার ছন্দে। প্রাকৃত বাংলার যে স্বকীয় দীর্ঘ-হ্রস্বতা আছে তার ছন্দে তার বিপর্য্যয় দেখিনে কিন্তু সাধু ভাষায় দেখি।

এই প্রাকৃত বাংলা মেয়েদের ছড়ায় বাউলের গানে রামপ্রসাদের পদে আপন স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সাধু সভায় তার সমাদর হয় নি ব'লে সে মুখ ফুটে নিজের সব কথা বল্‌তে পারে নি

এবং তার শক্তি যে কত তারও সম্পূর্ণ পরিচয় হোলো না। আজকের দিনের ডিমক্রেসির যুগেও সে ভয়ে ভয়ে দ্বিধা ক'রে চলেছে; কোথায় যে তার পংক্তি এবং কোথায় নয় তা স্থির হয়নি। এই সঙ্কোচে তার আত্মপরিচয়ের খর্ব্বতা হচ্চে। আমরা একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত বাংলাব লক্ষ্মীর পেট্‌রায় সংস্কৃত, পারসী ইংরেজি প্রভৃতি নানা ভাষা থেকেই শব্দ সঞ্চয় হচ্চে— সেই জন্যে শব্দেব দৈন্য প্রাকৃত বাংলার স্বভাবগত ব'লে মনে করা উচিত নয়। প্রয়োজন হোলেই আমরা প্রাকৃত ভাণ্ডারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারব। কাজেই যেখানে অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন বশত সংস্কৃত শব্দই সঙ্গত সেখানে প্রাকৃত বাংলায় তার বাধা নেই। আবার ফার্সি কথাও তার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি; সাধু বাংলায় তার বিঘ্ন আছে—কেননা সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে। প্রাকৃত ভাষার এই ঔদার্য্য গদ্যে পদ্যে আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ এই কথা মনে রাখ্‌তে হবে।

১৩২৪

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি

আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবেগ, এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গীতে বিচিত্র করে,—জীবিকার প্রয়োজনে নয়,—সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।

রূপসৃষ্টির প্রবাহই তো বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সে কথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎপ্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনোটা দেখা দেয় সোনা হয়ে, কোনোটা হয় সীষে। বিশেষ সংখ্যক মাত্রা ও বিশেষ বেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্ব-

সৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে। তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বল্‌ছেন, "শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি।" মানুষের সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান করছে। "এতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পম্ অধিগম্যতে।" মানবলোকের সব শিল্পই এই দেবশিল্পের অনুকৃতি—অর্থাৎ বিশ্বশিল্পের রহস্যকেই অনুসরণ করে মানব-শিল্প। সেই মূল রহস্য ছন্দে, সেই রহস্য আলোক-তরঙ্গে, শব্দতরঙ্গে, রক্ততরঙ্গে, স্নায়ুতন্তুর বৈদ্যুততরঙ্গে।

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দরচনার উপযোগী। ভূতলের টান থেকে মুক্ত ক'রে দেহকে সে তুলেছে ঊর্দ্ধদিকে। চলমান মানুষের পদে পদেই ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা, unstable equilibrium। এতেই তার বিপদ, এতেই তার সম্পদ। চলার চেয়ে পড়াই তার পক্ষে সহজ। ছাগলের ছানা চলা নিয়েই জন্মেছে, মানুষের শিশু চলাকে আপনি সৃষ্টি করেছে ছন্দে। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে পায়ে পায়ে দেহভারকে মাত্রাবিভক্ত ক'রে ওজন বাঁচিয়ে তবেই তার চলা সম্ভব হয়। সেটা সহজ নয়—মানবশিশুর চলার ছন্দসাধনা দেখলেই তা বোঝা যায়। যে পর্য্যন্ত আপন ছন্দকে

সে আপনি উদ্ভাবন না করে সে পর্য্যন্ত তার হামাগুড়ি। অর্থাৎ ভারাকর্ষণের কাছে তার অবনতি, সে পর্য্যন্ত সে নৃত্যহীন।

চতুষ্পদ জন্তুর নিত্যই হামাগুড়ি। তাব চলা মাটিব কাছে হার মেনে চলা। লাফ দিয়ে যদি বা সে উপরে ওঠে পরক্ষণেই মাটির দরবাবে ফিবে এসেই তার মাথা হেঁট। বিদ্রোহী মানুষ মাটির একান্ত শাসন থেকে দেহভারকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তাতেই চালায় প্রয়োজনের কাজ এবং অপ্রয়োজনের লীলা। ভূমির টানের বিরুদ্ধে ছন্দের সাহায্যে তার এই জয়লব্ধ শক্তি।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। শিল্পই হচ্চে আত্ম-সংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত ক'রে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠ-পাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্ব্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকাবে

প্রকাশিত, কেননা বিচিত্র তার ছন্দ। "ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" শিল্পযজ্ঞের যজমান আত্মাকে সংস্কৃত করেন, তাকে করেন ছন্দোময়।

যেমন মানুষের আত্মার তেমনি মানুষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দোময় সংস্কৃতি। সমাজও শিল্প। সমাজে আছে নানা মত, নানা ধর্ম্ম, নানা শ্রেণী। সমাজের অন্তরে সৃষ্টিতত্ত্ব যদি সক্রিয় থাকে তাহোলে সে এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্যংশের মধ্যে কোথাও ওজনের অত্যন্ত বেশি অসাম্য না হয়। অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে ছন্দের এই ত্রুটিতে, অনেক সমাজ মরেছে ছন্দের এই অপরাধে। সমাজে যখন হঠাৎ কোনো একটা সংরাগ অতিপ্রবল হয়ে ওঠে তখন মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট। কিম্বা যখন এমন সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝা অচল হয়ে কাঁধে চেপে থাকে যাকে ছন্দ বাঁচিয়ে সম্মুখে বহন ক'রে চলা সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয় তখন সেই সমাজের পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের ধর্ম্মই চলা, সংসারের ধর্ম্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেই জন্যেই তার বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে দুর্গতি।

মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয় এমন আর কোনো জীবে দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহ-ভঙ্গীর মতো সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখ, দুঃখ, রাগ, বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। "আমি ভালোবাসি"—এই কথাটিকে ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার "আমি ভালোবাসি"—এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র ক'রে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে যে-সৃষ্টি সর্ব্বজনের, সর্ব্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহশোক দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন

সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ। গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালে একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি ; সে কেবল তালের নেশা-জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। তার সঙ্গে ক্রমে ভাবের দোলা মেশে। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই যখন লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে রূপসৃষ্টিই হয় চরম, তখন নাচটা হয় সর্ব্বজনের ভোগ্য, সেই নাচটা ক্ষণ-কালের পরে বিস্মৃত হোলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।

নাচতে দেখেছি সারসকে। সেই নাচকে কেবল আঙ্গিক বলা যায় না অর্থাৎ টেক্‌নিকেই তার পরিশেষ নয়। আঙ্গিকে মন নেই, আছে নৈপুণ্য। সারসের নাচের মধ্যে দেখেছি ভাব এবং তার চেয়েও আরো কিছু বেশি। সারস যখনি মুগ্ধ করতে চেয়েছে আপন দোসরকে, তখনি তার মন সৃষ্টি করতে চেয়েছে নৃত্য-ভঙ্গীর সংস্কৃতি, বিচিত্র ছন্দের পদ্ধতি। সারসের মন আপন দেহে এই নৃত্যশিল্প রচনা করতে পেরেছে তার কারণ তার দেহভারটা অনেক মুক্ত।

কুকুরের মনে আবেগের প্রবলতা যথেষ্ট কিন্তু তার

দেহটা বন্ধক দেওয়া মাটির কাছে। মুক্ত আছে কেবল তার ল্যাজ। ভাবাবেগের চাঞ্চল্যে কুকুরীয় ছন্দে ঐ ল্যাজটাতেই চঞ্চল হয় তার নৃত্য, দেহ আঁকুবাকু করে বন্দীর মতো।

মানুষের সমগ্র মুক্ত দেহ নাচে, নাচে মানুষের মুক্ত কণ্ঠের ভাষা। তাদের মধ্যে ছন্দের সৃষ্টিরহস্য যথেষ্ট জায়গা পায়। সাপ অপদস্থ জীব, মানুষের মতো পদস্থ নয়। সমস্ত দেহ সে মাটিকে সমর্পণ ক'রে বসেছে। সে কখনো নিজে নাচে না। সাপুড়ে তাকে নাচায়। বাহিরের উত্তেজনায ক্ষণকালের জন্য দেহের এক অংশকে সে মুক্ত ক'রে নেয়, তাকে দোলায় ছন্দে। এই ছন্দ সে পায় অন্যের কাছ থেকে, এ তার আপন ইচ্ছার ছন্দ নয়। ছন্দ মানেই ইচ্ছা। মানুষের ভাবনা রূপগ্রহণের ইচ্ছা করেছে নানা শিল্পে, নানা ছন্দে। কত বিলুপ্ত সভ্যতার ভগ্নাবশেষে বিস্মৃত যুগের ইচ্ছার বাণী আজও ধ্বনিত হচ্চে তার কত চিত্রে, জলপাত্রে, কত মূর্ত্তিতে। মানুষের আনন্দময় ইচ্ছা সেই ছন্দো-লীলার নটবাজ, ভাষায় ভাষায় তার সাহিত্যে সেই ইচ্ছা নব নব নৃত্যে আন্দোলিত।

মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন

প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্য ভাষায়। কোনো মানুষের চলাকে বলি সুন্দর, কোনোটাকে বলি তার উল্টো। তফাৎটা কিসে? সে কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তাহোলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।

পালে-চলা নৌকো সুন্দর, তাতে নৌকোর ভারটার সঙ্গে নৌকোর গতির সম্পূর্ণ মিলন, সেই পরিণয়ে শ্রী উঠেছে ফুটে, অতি-প্রয়াসের অবমান হয়েছে অন্তর্হিত। এই মিলনেই ছন্দ। দাঁড়ি দাঁড় টানে, সে লগি ঠেলে, কঠিন কাজের ভারটাকে সে কমিয়ে আনে কেবল ছন্দ রেখে। তখন কাজের ভঙ্গী হয় সুন্দর। বিশ্ব চলেছে প্রকাণ্ড ভার নিয়ে বিপুল দেশে নিরবধি কালে সুপরিমিতির ছন্দে। এই সুপরিমিতির প্রেরণায় শিশিরের ফোঁটা থেকে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত সুগোল ছন্দে গড়া। এই জন্যেই ফুলের পাপড়ি সুবঙ্কিম, গাছের পাতা সুঠাম, জলের ঢেউ সুডোল।

জাপানে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার একটি কলা-বিদ্যা আছে। যেমন-তেমন আকারে পুঞ্জীকৃত পুষ্পিত

শাখায় বস্তুভারটাই প্রত্যক্ষ, তাকে ছন্দ দিয়ে যেই শিল্প করা যায় তখন সেই ভারটা হয় অগোচর, হালকা হয়ে গিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে সহজে।

প্রাচীন জাপানের একজন বিখ্যাত বীর এই ফুল সাজানো দেখতে ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন, এই সজ্জাপ্রকরণ থেকে তাঁর মনে আসত আপন যুদ্ধব্যবসায়ের প্রেরণা। যুদ্ধও ছন্দে বাঁধা শিল্প, ছন্দের সমুৎকর্ষ থেকেই তার শক্তি। এই কারণেই লাঠি খেলাও নৃত্য।

জাপানে দেখেছি চা-উৎসব। তাতে চা-তৈরি, চা-পরিবেষণের প্রত্যেক অংশই সযত্ন সুন্দর। তার তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মের সৌষ্ঠব এবং কর্ম্মের নৈপুণ্য একসঙ্গে গাঁথা। গৃহিণীপণা যদি সত্য হয় তাকে সুন্দর হোতেই হবে, অকৌশল ধরা পড়ে কুশ্রীতায়, কর্ম্মের ও লোকব্যবহারের ছন্দোভঙ্গে। ভাঙা ছন্দের ছিদ্র দিয়েই লক্ষ্মী বিদায় নেন।

এতক্ষণ ছন্দকে দেখা গেল নৃত্যে। কেননা ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহেই। তারপরে দেহের ইসারা মেলে ভাষার ইসারায়। এবার ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যাক ছন্দকে।

সেই একই কথা, ভার আর গতি, সেই দুইয়ের যোগে ওজন বাঁচিয়ে চলা। জন্তুর আওয়াজের পরিধি কতটুকুই বা; তাতে জোর থাকতে পারে কিন্তু ভার সামান্য। কুকুর যতই ডাকুক্, শেয়াল যতই চেঁচাক, ধ্বনির ওজন বাঁচিয়ে চলবার সমস্যা তাদের নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু আভাস পাওয়া যায়। গাধার পরে অবিচার করতে চাইনে। সে শুধু পরের ময়লা কাপড় বহন করে তা নয়, এ পর্য্যন্ত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আপন প্রভূত অখ্যাতি বহন ক'রে এসেছে। কিন্তু যখনি সে নিজের ডাককে দীর্ঘায়িত করে, তখনি পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে তাকে ধ্বনির ওজন ভাগ করতে হয়। নিজের ব্যবসায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই ব্যাপারকে ছন্দ বলতে কুণ্ঠিত হচ্চি; কিন্তু আর কী বলব জানি নে।

মানুষকে বহন করতে হয় ভাষার সুদীর্ঘতা। প্রলম্বিত ভাষার ওজন তাকে রাখতেই হয়। মানুষের সেই বাক্যের সঙ্গে তার গানের সুর যখন মিশ্‌ল তখন গীতিকলা হোলো দীর্ঘায়ত। নানাবিধ তাল নিযুক্ত হয়েছে তার ভার বইতে। কিন্তু তাল অর্থাৎ ছন্দকে কেবল ভারবাহক বললে চলবে না, সে তো ধ্বনিভারের

ঝাঁকা-মুটে নয়। ভারগুলিকে নানা আয়তনে বিভক্ত ক'রে যেই সে তাকে গতি দেয় অমনি রূপ নিয়ে সঙ্গীত আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে। ভাষা অবলম্বন ক'রে যখন আমরা খবর দিতে চাই তখন বিবরণের সত্যতা রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব; কিন্তু যখন রূপ দিতে চাই তখন সত্যতার চেয়ে বেশি আবশ্যক ছন্দের।

"একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল"—এটা নিছক খবর। গল্প হিসাবে বা ঘটনা হিসাবে সত্য হোলে এর আর কোনোই জবাবদিহী নেই। কিন্তু গলায় হাড় বেঁধা জন্তুটার ল্যাজ যদি প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যের মধ্যে আছড়িয়ে নিতে চাই তবে ভাষায় লাগাতে হবে ছন্দের মন্ত্র।

> বিদ্যুৎ-লাঙ্গুল করি' ঘনতর্জ্জন
> বজ্রবিদ্ধ মেঘ করে বারিবর্জ্জন।
> তদ্রূপ যাতনায় অস্থির শার্দ্দূল
> অস্থিবিদ্ধগলে করে ঘোর গর্জ্জন॥

কাব্যসাহিত্য কেবল রসসাহিত্য নয় তা রূপসাহিত্য। সাধারণত ভাষায় শব্দগুলি অর্থবহন করে, কিন্তু ছন্দে তা'রা রূপ গ্রহণ করে।

ছন্দ সম্বন্ধে এই গেল আমার সাধারণ বক্তব্য। বিশ্বের ভাষায় মানুষের ভাষায় রূপ দেওয়া তার কাজ। এখন বাংলা কাব্যছন্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা যাক।

প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি উদ্ভাবনা আছে। তার থেকে তার স্বরূপ চেনা যায়। ইংরেজিতে বেশির ভাগ শব্দে স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা নেই ব'লে সে যেন হয়েছে সরদ যন্ত্রের মতো, আঙুলের আঘাতে তার ঐকমাত্রিক ধ্বনিগুলি উচ্চকিত, ইটালিয়ানে ছড়ির লম্বা টানে বেহালার টানা সুর।

বাংলাভাষারও নিজের একটা বিশেষ ধ্বনিস্বরূপ আছে। তার ধ্বনির এই চেহারা হসন্ত বর্ণের যোগে। যে বাংলা আমাদের মায়ের কণ্ঠগত, জ্যেষ্ঠতাতের লেখনীগত নয়, ইংরেজির মতো তারও সুর ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘাতে। আজ সাধুভাষার ছন্দে জোর দেবার অভিপ্রায়ে অভিধান ঘেঁটে যুক্তবর্ণের আয়োজনে লেগেছি, অথচ প্রাকৃত বাংলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে ব'লেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে। এই ভাষায় একটি শ্লোক রচনা করা যাক একটিও যুক্তবর্ণ না দিয়ে—

দূর সাগরের পারের পবন
আসবে যখন কাছের কূলে
রঙীন আগুন জ্বালবে ফাগুন
মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

হসন্তের ধাক্কায় যুক্তবর্ণের ঢেউ আপনি উঠছে।

চীন দেশের সাংঘাই নগরে একটি আরামবাগ আছে। অনেককাল সেখানে চীনের লোকেরই প্রবেশ নিষেধ ছিল। তেমনি বাংলাদেশের সাহিত্য আরামবাগ থেকে বাংলাভাষার স্বকীয়ধ্বনিরূপটি পণ্ডিত পাহারাওয়ালার ধাক্কা খেয়ে অনেককাল বাইরে বাইরে ফিরেছিল।

ভাষার শব্দে অর্থ আছে, স্বর আছে। অর্থ জিনিষটা সকল ভাষাতেই এক, স্বরটা প্রত্যেক ভাষাতেই স্বতন্ত্র। জল শব্দে যা বোঝায় water শব্দেও তাই বুঝি কিন্তু ওদের সুর আলাদা। ভাষা এই সুর নিয়ে শিল্পরচনা করে, ধ্বনির শিল্প। সেই রূপসৃষ্টির যে ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা-ভাষার আপন সম্বল, পণ্ডিতরা তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন কেননা তাঁরা অর্থের মহাজন কিন্তু যাঁরা রূপরসিক তাঁদের মূলধন ধ্বনি। প্রাকৃত বাংলার দুয়োরাণীকে যারা সুয়োরাণীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে

স্থান দিয়েছে সেই অশিক্ষিত-লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলা ভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত ক'রে দিই।

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাৎ
সেইখানে হাত
ঢলামলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
ক'রয়া চুপ,
রয় নিরালা।
ওরে লালন-ভেড়ের লোক-দেখানো
মুখে হরি হরি বোলা।

আর একটি—

এমন মানব-জনম আর কি হবে ?
যা করো মন ত্বরায় করো
এই ভবে।
অনন্তরূপ ছিষ্টি করেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।
দেবদেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য্য-ভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠিল নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
লালন কয় কাতরভাবে॥

এই ছন্দের ভঙ্গী একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু-প্রসাধনে মেজে ঘ'ষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস। ব্যঙ্গ কবিতায় এ ভাষার জোর কত

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে তার নমুনা দিই। কুইন ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন—

তুমি মা কল্পতরু
মোরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিঙ বাঁকানো,
কেবল খাব খড়বিচিলি ঘাস,
যেন রাঙা আম্‌লা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভূষি পেলেই খুসি হ'ব
ঘুষি খেলে আর বাঁচব না।

কেবল এর হাসিটা নয়, এর ছন্দের বিচিত্র ভঙ্গীটা লক্ষ্য ক'রে দেখবার বিষয়।

অথচ এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হোত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমন ভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হোতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ ক'রে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্য্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মান্‌ব না। এই যে-বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ —এ ভাষা প্রাণবান। এই জন্যে সংস্কৃত বলো, ফার্সি বলো, ইংরেজি বলো সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে। খাঁটি হিন্দী ভাষারও সেই গুণ।

যারা হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়ে নি তাদের একটা লেখা তুলে দিই—

চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলেম তারে
চিনব তবে কেমন ক'রে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে চিনতে যদি পাই।

প্রাকৃত বাংলাকে গুরুচণ্ডালী দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।

চলিত বাংলাভাষার প্রসঙ্গটা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। তার কারণ এ ভাষাকে যারা প্রতিদিন ঘরে দেন স্থান, তাঁদের অনেকে সাহিত্যে একে অবজ্ঞা করেন। সেটাতে সাহিত্যকে তার প্রাণরসের মূল আধার থেকে সরিয়ে

নেওয়া হচ্চে জেনে আমার আপত্তিকে বড়ো ক'রেই জানালুম। ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনি-প্রকৃতির বিচার অত্যাবশ্যক সেই কথাটা এই উপলক্ষ্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন ক'রে, সেই ভাষায় বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে নি। আর একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে—এই ভাষা বাংলার হসন্ত শব্দের ধ্বনিকে আপন ব'লে গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।

শিখরিণী মালিনী মন্দাক্রান্তা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি বড়ো বড়ো গম্ভীর চালের ছন্দ গুরুলঘুস্বরের যথানির্দ্দিষ্ট বিন্যাসে অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ। বাংলায় আমরা বিষম মাত্রামূলক ছন্দ কিছু কিছু চালিয়েছি কিন্তু বিষম মাত্রার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির দ্বারা তারো একটা সম্মিতি রক্ষা হয়।

শিমূল রাঙা রঙে
চোখেরে দিল ভ'রে।

নাকটা হেসে বলে
হায়রে যাই ম'রে।
নাকের মতে, গুণ
কেবলি আছে ঘ্রাণে,
রূপ যে রং খোঁজে
নাকটা তা কি জানে?

এখানে বিষম মাত্রার পদগুলি জোড়ে জোড়ে এসে চলনের অসমানতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিষম মাত্রার বিস্তার আরো অনেক বড়ো। এই সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান ক'রে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দরচনা বাংলায় দেখেছি—সে বহুকাল পূর্ব্বে স্বপ্নপ্রয়াণে।

লজ্জা বলিল, "হবে
কি লো তবে,
কতদিন পরাণ রবে
অমন করি'।
হইয়ে জলহীন
যথা মীন
রহিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি'।"

এর প্রত্যেক ভাগে মাত্রাসংখ্যা স্বতন্ত্র।

সংস্কৃত ছন্দে বিবিধ মাত্রার এই গতিবৈচিত্র্য যা সম্মিতি উপেক্ষা ক'রেও ভঙ্গীলীলা বাঁচিয়ে চলে বাংলায় তার অনুকৃতি এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয় নি। নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার সখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন। তবু ব'লে রাখি তাতে তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনিতরঙ্গ পাবেন না। মন্দাক্রান্তার মাত্রা গোণা একটা বাংলা ছন্দের নমুনা দেওয়া যাক্—

সারা প্রভাতের বাণী
বিকালে গেঁথে 'আনি'
ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।
ভয়ে ভয়ে অবশেষে
তোমার কাছে এসে
কথা যে যায় ভেসে
আঁখিজলে।
দিন যবে হয় গত
না-বলা কথা যত
খেলার ভেলা-মতো
ফেলা ভরে

লীলা তার করে সারা
যে পথে যাইছাবা
রাতের যত তারা
যায় স'রে ॥

শিখরিণীকেও এই ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে।—

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে
যা-খুসি কহি কত ;
বিরহব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মূরতি যে
গড়িছে অবিরত।
এ পূজা ধায় যবে তোমা পানে
বাজে কি কোনোখানে,
কাঁপে কি মন তব ?
জানো কি দিবানিশি বহুদূরে
গোপনে বাজে সুরে
বেদনা অভিনব ?

ছন্দ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা বাকি রইল আর কোনো সময়ে পরে বলবার ইচ্ছা আছে। উপসংহারে আজ কেবল এই কথাটি বলতে চাই যে, ছন্দের একটা

দিক আছে যেটাকে বলা যেতে পারে কৌশল। কিন্তু তার চেয়ে আছে বড়ো জিনিষ যেটাকে বলি সৌষ্ঠব। বাহাদুরি তার মধ্যে নেই, সমগ্র কাব্যসৃষ্টির কাছে ছন্দের আত্মবিস্মৃত আত্মনিবেদনে তার উদ্ভব। কাব্য পড়তে গিয়ে যদি অনুভব করি যে, ছন্দ পড়ছি তা হোলে সেই প্রগল্‌ভ ছন্দকে ধিক্কার দেব। মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড পাকস্থলী অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র—সৃষ্টিকর্ত্তা তাদের স্বাতন্ত্র্য ঢাকা দিয়েছেন। দেহ তাদেরকে ব্যবহার করে, প্রকাশ করে না, করে প্রকাশ যখন রোগে ধরে; তখন যকৃৎটা হয় প্রবল তার কাছে মাথা হেট করে লাবণ্য। শরীরে স্বাস্থ্যের মতোই কবি ছন্দকে ভুলে থাকে ছন্দ যখন তার যথার্থ আপন হয়। *

১৩৪১

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত। ১৩৪০ ।।

গদ্য ছন্দ

ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাৎ এই যে, কথা একটাতে চলে, আরেকটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে ; যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক প্রবীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসায়ীর সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।

এই ছবি গান কাব্যকে আমরা গড়ে-তোলা জিনিষ ব'লে অনুভব করিনে ; মনে লাগে যেন তারা হয়ে-ওঠা পদার্থ। তাদের মধ্যে উপাদানের বাহ্য সংঘটনটা অত্যন্ত বেশি ধরা দেয় না, দেখা যায় উদ্ভাবনার একটা অখণ্ড প্রকাশ, যে-প্রকাশ একান্তভাবে আমাদের বোধের সঙ্গে মেলে। বিশ্বসৃষ্টিতে স্পন্দিত আকাশ, কম্পিত বাতাস, চঞ্চল হৃদয়াবেগ স্নায়ুতন্তুতে ছন্দো-বিভঙ্গিত হয়ে আলোতে গানেতে বেদনায় আমাদের

চৈতন্যে কেবলি এঁকে দিচ্ছে আলিম্পন। ছবি গান কাব্যও আপন ছন্দঃস্পন্দনের চলদ্‌বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান আকৃতিমান করে তুলছে নানাপ্রকার চাঞ্চল্যে। অন্তরে যেটা এসে প্রবেশ করছে সেটা মিলে যাচ্ছে আমাদের চৈতন্যে, সে আর স্বতন্ত্র থাকছে না।

ঘোড়ার ছবি দেখি প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে। সেখানে ঘোড়ার আকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত হিসাব ঠিকঠাক মেলে। তাতে খবর পাই, সে খবর বাইরের খবর, তাতে জ্ঞানলাভ করি, ভিতরটা খুসি হয়ে ওঠে না। এই খবরটা স্থাবর পদার্থ। রূপকার ঘোড়ার যে ছবি আঁকে তার চরম উদ্দেশ্য খবর নয় খুসি, এই খুসিটা বিচলিত চৈতন্যের বিশেষ উদ্বোধন। ভালো ছবির মধ্যে বরাবরের মতো একটা সচলতার বেগ রয়েই গেল, তাকে বলা চলে পর্পেচুয়ল মূভ্‌মেণ্ট। প্রাণিতত্ত্বের বইয়ে ঘোড়ার ছবিটা চারিদিকেই সঠিক ক'রে বাঁধা, খাঁটি খবরের যাথার্থ্যে পিল্‌পেগাড়ি করা তার সীমানা। রূপকারের রেখায় রেখায় তার তুলি মৃদঙ্গের বোল বাজিয়েছে, দিয়েছে সুষমার নাচের দোলা। সেই ঘোড়ার ছবিতে চতুষ্পদজাতীয় জীবের খাঁটি খবর

না মিলতেও পারে, মিলবে ছন্দ, যার নাড়া খেয়ে সচকিত চৈতন্য সাড়া দিয়ে ব'লে ওঠে, হাঁ এইতো বটে, আপনারই মধ্যে সেই সৃষ্টিকে সে স্বীকার করে, সেই থেকে চিরকালের মতো সেই ধ্বনিময় রূপ আমাদের বিশ্বপরিচয়ের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়; খবরটা একবারের বেশি দুবার বল্‌লে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরকার মতো বল্‌তে থাকলেন "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ"; কবির মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চ'ড়ে বস্‌ল ছন্দ পক্ষিরাজের পিঠে, চল্‌ল চির-কালের মনোহরণ করতে।

গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ ক'রে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ ক'রে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাই বাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাই বাছাইয়ের দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়। এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছ ভাবে প্রত্যেক

সৈনিকের মধ্যে নেই। মানুষকে উপাদান ক'রে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু ইন্ধনের হোমহুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব। ছন্দঃসজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষায় তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।

চিত্রসৃষ্টিতেও এ কথা খাটে। তার মধ্যে রেখার ও রঙের একটা সামঞ্জস্যবদ্ধ সাজাই বাছাই আছে। সে প্রতিরূপ নয়, সে স্বরূপ। তার উদ্দেশ্য রিপোর্ট করা নয়, তার উদ্দেশ্য চৈতন্যকে কবুল করিয়ে নেওয়া—এইতো স্বয়ং দেখলুম। গুণীর হাতে রেখা ও রঙের ছন্দোবন্ধন হোলেই ছবির নাড়ীর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন চলতে থাকে,আমাদের চিৎস্পন্দন তার লয়টাকে স্বীকার করে, ঘটতে থাকে গতির সঙ্গে গতির সহযোগিতা, বাতাসের হিল্লোলের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো।

ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হোতে পারল নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, আবর্ত্তিত হোতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে, স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

ছন্দকে কেবল আমরা ভাষায় বা রেখায় স্বীকার করলে সব কথা বলা হয় না। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। ভাবকে এমন ক'রে সাজানো যায় যাতে সে কেবলমাত্র অর্থবোধ ঘটায় না, প্রাণ পেয়ে ওঠে আমাদের অন্তরে। বাছাই ক'রে সুবিন্যস্ত সুবিভক্ত ক'রে ভাবের শিল্প রচনা করা যায়। বর্জ্জন গ্রহণ সজ্জীকরণের বিশেষ প্রণালীতে ভাবের প্রকাশে সঞ্চারিত হয় চলৎশক্তি। যেহেতু সাহিত্যে ভাবের বাহন ভাষা সেই কারণে সাহিত্যে যে ছন্দ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সে ছন্দ ভাষার সঙ্গে জড়িত। তাই অনেক সময়ে এ কথাটা ভুলে যাই যে ভাবের ছন্দই তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের মনকে বিচলিত করে। সেই ছন্দ ভাবের সংযমে, তার বিন্যাসনৈপুণ্যে।

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ ক'রে ব্যক্ত করতে হোলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট ক'রে তাকে ঠিক-মতো শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। সে তাকে প্রাণের বেগ দেবার জন্যে নয়, তাকে প্রকৃষ্ট অর্থ দেবার জন্যেই। শঙ্করের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। তার প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই,

তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সঙ্গত পংক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের নামে যে "আনন্দলহরী" কাব্য প্রচলিত, তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত অথচ প্রাণবান গতিমান রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই :—

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণং।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী
পরীবাহস্রোতঃ সরণিরিব সীমন্তসরণিঃ॥

ঐ সিঁথির রেখা আমাদের কল্যাণ দিক্ যে রেখাটি তোমার মুখসৌন্দর্যধারার স্রোতঃপথের মতো। আর যে সিঁদুর আঁকা রয়েছে তোমার ঐ সিঁথিতে, সে যেন নবীন সূর্য্যের আলো, তাকে ঘন কবরীভারের অন্ধকার শত্রু হয়ে বন্দী ক'রে রেখেছে।

আনন্দলহরীতে যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রতিমা। নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্য্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকবরী-পুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখার সিন্দূররাগে

তরুণ সূর্য্যকিরণ, এই অল্প কথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

যে ছবি দিয়ে এই ছবি আঁকা এ শুধু ভাষার ছবি নয়, এ ভাবের ছবি। এতে ভাবের গুটিকয়েক উপকরণ উপমার গুচ্ছে সাজানো, তাই দিয়েই ওর জাদু। ওর নিত্যসচল কটাক্ষে অনেক না-বলা কথার ইসারা রয়ে গেল।

একদিন ছিল যখন ছাপার অক্ষরের সাম্রাজ্য পত্তন হয় নি। যেমন কলকারখানার আবির্ভাবে পণ্যবস্তুর ভূরি উৎপাদন সম্ভবপর হোলো তেমনি লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রসাদে সাহিত্যে শব্দসঙ্কোচের প্রয়োজন চলে গেছে। আজ সরস্বতীর আসনই বলো, আর তাঁর ভাণ্ডারই বলো, প্রকাণ্ড আয়তনের। সাবেক সাহিত্যের দুই বাহন, তার উচ্চৈঃশ্রবা আর তার ঐরাবত, তার শ্রুতি ও স্মৃতি; তারা নিয়েছে ছুটি। তাদের জায়গায় যে যান এখন চল্‌ল, তার নাম দেওয়া যেতে পারে লিখিতি। সে রেলগাড়ির মতো, তাতে কোনোটা যাত্রীর কামরা কোনোটা মালের। কোনোটাতে বস্তুর

পিণ্ড, সংবাদপুঞ্জ, কোনোটাতে সজীব যাত্রী, অর্থাৎ রস-সাহিত্য। তার অনেক চাকা, অনেক কক্ষ ; এক সঙ্গে মস্ত মস্ত চালান। স্থানের এই অসঙ্কোচে গদ্যের ভূরি-ভোজ।

সাহিত্যে অক্ষরের অতিথিশালায় বাক্যের এত বড়ো সদাব্রতের আয়োজন যখন ছিল না তখন ছন্দের সাহায্য ছিল অপরিহার্য্য। তাতে বাধা পেত শব্দের অতিব্যয়িতা, আর ছন্দ আপন সাঙ্গীতিক গতিবেগের স্মৃতিকে রাখত সচল ক'রে। সেদিন পদ্যছন্দের সন্তান ছিল না ভাষায়, সেদিন বাণীর ছন্দের সঙ্গে ভাবের ছন্দের অন্বয় বিবাহ অর্থাৎ মনোগেমি ছিল প্রচলিত। এখন বই পড়াটা অনেক স্থলেই নিঃশব্দ পড়া, কানের একান্ত শাসন তাই উপেক্ষিত হোতে পারে। এই সুযোগেই আজকাল কাব্য-শ্রেণীয় রচনা অনেক স্থলে পদ্যছন্দের বিশেষ অধিকার এড়িয়ে ভাবচ্ছন্দের মুক্তি দাবী করছে।

গদ্যসাহিত্যের আরম্ভ থেকেই তার মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করেছে ছন্দের অন্তঃশীলা ধারা। রস যেখানেই চঞ্চল হয়েছে, রস যেখানেই চেয়েছে রূপ নিতে, সেখানেই শব্দগুচ্ছ স্বতই সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ভাবরসপ্রধান গদ্য-আবৃত্তির মধ্যে সুর লাগে অথচ তাকে রাগিণী বলা চলে

না, তাতে তালমান স্বরের আভাসমাত্র আছে। তেমনি গদ্যরচনায় যেখানে রসের আবির্ভাব সেখানে ছন্দ অতি-নির্দ্দিষ্ট রূপ নেয় না, কেবল তার মধ্যে থেকে যায় ছন্দের গতিলীলা।

করবী গাছের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার ডালে ডালে জুড়ি জুড়ি সমান ভাগে পত্রবিন্যাস। কিন্তু বটগাছে প্রশাখাগত সুনিয়মিত পত্রপর্য্যায় চোখে পড়ে না। তাতে দেখি বহু শাখা প্রশাখায় পত্রপুঞ্জের বড়ো বড়ো স্তবক। এই অনতিসমান রাশীকৃত ভাগগুলি বনস্পতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পেয়েছে, তাকে দিয়েছে একটি বৃহৎ চারিত্ররূপ। অথচ পাথরের যে পিণ্ডীকৃত স্থাবর বিভাগগুলি দেখা যায় পাহাড়ে, এ সে রকম নয়। এর মধ্যে দেখতে পাই প্রাণশক্তি অবলীলাক্রমে আপন নানায়তন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওজন প্রতিনিয়ত বিশেষ মহিমার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছে, তার মধ্যে দেখি যেন মহাদেবের তাণ্ডব, নন্দীদেবের নৃত্য, সে অপ্সরীর নাচ নয়। একেই তুলনা করা যায় সেই আধুনিক কাব্য-রীতির সঙ্গে, গদ্যের সঙ্গে যার বাহ্যরূপ মেলে আর পদ্যের সঙ্গে আন্তররূপ।

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর "পালামৌ" গ্রন্থে কোলনারীদের

নাচের বর্ণনা করেছেন। নৃতত্ত্বে যেমন ক'রে বিবরণ লেখা হয় এ তা নয়, লেখক ইচ্ছা করেছেন নাচের রূপটা রসটা পাঠকদের সামনে ধরতে। তাই এ লেখায় ছন্দের ভঙ্গী এসে পৌঁচেছে অথচ কোনো বিশেষ ছন্দের কাঠামো নেই। এর গদ্য সমমাত্রায় বিভক্ত নয় কিন্তু শিল্পপ্রচেষ্টা আছে এর গতির মধ্যে।

গদ্যসাহিত্যে এই যে বিচিত্র মাত্রার ছন্দ মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র পরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্ব্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ ব'লেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় প্রাচীন কালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয় তাকে গতি দেবার জন্যে তা সমমাত্রায় না হোলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

পদ্যছন্দের প্রধান লক্ষণ পংক্তি সীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক একটি পংক্তি সম্পূর্ণ। সেই পংক্তিশেষে একটি ক'রে বড়ো

যতি। বলা বাহুল্য গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেইখানেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্যছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসঙ্গতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয় অর্থনির্ব্বিচারে সেইখানে পংক্তি শেষ করে। পদ্য সব প্রথমে এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে, পংক্তির বাইরে পদচারণা সুরু করলে। আধুনিক পদ্যে এই স্বৈরাচার দেখা দিল পয়ারকে আশ্রয় ক'রে।

বলা বাহুল্য এক মাত্রা চলে না। "বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" যেই দুইয়ের সমাগম অমনি হোলো চলা সুরু। থাম আছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থেমে। জন্তুর পা, পাখীর পাখা, মাছের পাখনা দুই সংখ্যার যোগে চলে। সেই নিয়মিত গতির উপর যদি আর-একটা একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে সেই গতিতে ভারসাম্যের অপ্রতিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। এই অনিয়মের ঠেলায় নিয়মিত গতির বেগ বিচিত্র হয়ে ওঠে। মানুষের দেহটা তার দৃষ্টান্ত। আদিমকালের চারপেয়ে মানুষ আধুনিক কালে দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার কোমর থেকে পদতল পর্য্যন্ত দুই পায়ের সাহায্যে মজবুৎ,

কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত টলমলে। এই দুই ভাগের অসামঞ্জস্যকে সামলাবার জন্যে মানুষের গতিতে মাথা হাত কোমর পা বিচিত্র হিল্লোলে হিল্লোলিত। পাখীও দুই পায়ে চলে, কিন্তু তার দেহ স্বভাবতই দুই পায়ের ছন্দে নিয়মিত। টলবার ভয় নেই তার। দুই মাত্রায় অর্থাৎ জোড়মাত্রায় যে পদ বাঁধা হয় তার মধ্যে দাঁড়ানোও আছে চলাও আছে, বেজোড় মাত্রায় চলার ঝোঁকটাই প্রধান। এইজন্যে অমিত্রাক্ষরে যেখানে সেখানে থেমে যাবার যে নিয়ম আছে সেটা পালন করা বিষমমাত্রার ছন্দের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্যে বেজোড় মাত্রায় পদ্যধর্ম্মই একান্ত প্রবল। চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্ বেজোড় মাত্রার দরজাটা খুলে দিয়ে—প্রথম পরীক্ষা হোক্ তিনমাত্রার মহলে।

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠালো লিপিকা। দিকের প্রান্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা ; বহিয়া চিত্ত-চকিত
ব্যাকুল আকূতি। উৎসুক ধরা
ঈর্ষা ভাবায়, পারে না লুকাতে
বুকের কাঁপন পল্লবদলে।

বকুলকুঞ্জে বহে সে প্রাণের
মুগ্ধ প্রলাপ ; উল্লাস ভাসে
চামেলিগন্ধে পূর্ণ গগনে।

পয়ার ছন্দের মতো এর গতি সিধে নয়। এই তিনমাত্রার এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের নায়িকাদের মতো মরালগমনে, ডাইনে বাঁয়ে ঝোঁকে ঝোঁকে হেল্‌তে দুল্‌তে।

এবার যে ছন্দের নমুনা দেব সেটা তিন দুই মাত্রার, গানের ভাষায় ঝাঁপতাল জাতীয়।

চিত্ত আজি দুঃখদোলে
আন্দোলিত। দূরের স্বর
বক্ষে লাগে। অঙ্গনের
সম্মুখেতে পান্থ মন
ক্লান্ত পদে গিয়েছে চলি'
দিগন্তরে। বিবশ বেণু
ধ্বনিছে তাই মন্দবায়ে।
ছন্দে তারি কুন্দ ফুল
ঝরিছে কত, চঞ্চলিয়া
কাঁপিছে কাশ গুচ্ছ শিখা।

এ ছন্দ পাঁচমাত্রার মাঝখানে ভাগ ক'রে থামতে

পারে না ; এর যতিস্থাপনায় বৈচিত্র্যের যথেষ্ট স্বাধীনতা নেই।

এবার দেখানো যাক্ তিন চার মাত্রার ছন্দ।

মালতী সারাবেলা ঝরিছে রহি রহি
কেন যে বুঝি না তো। হায় রে উদাসিনী
পথের ধূলিরে কি করিলি অকারণে
মরণ সহচরী। অরুণ গগনের
ছিলি তো সোহাগিনী, শ্রাবণ বরিষণে
মুখর বনভূমি তোমারি গন্ধের
গর্ব প্রচারিছে সিক্ত সমীরণে
দিকে দিগন্তরে। কী অনাদরে তবে
গোপনে বিকশিয়া বাদল রজনীতে
প্রভাত আলোকেরে কহিলি, "নহে নহে।"

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে দেখা যায় অসম ও বিষম মাত্রার ছন্দে পংক্তিলঙ্ঘন চলে বটে কিন্তু তার এক একটি ধ্বনিগুচ্ছ সমান মাপের, তাতে ছোটো বড়ো ভাগের বৈচিত্র্য নেই। এই জন্যেই একমাত্র পয়ার ছন্দই অমিত্রাক্ষর রীতিতে কতকটা গদ্যজাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে।

এইবার আমার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দেবার

সময় এল যে, এই সব পংক্তিলঙ্ঘক ছন্দের কথাটা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে। মূল কথাটা এই যে কবিতায় ক্রমে ক্রমে ভাষাগত ছন্দের আঁটা-আঁটির সমান্তরে ভাবগত ছন্দ উদ্ভাবিত হচ্চে। পূর্ব্বেই বলেছি তার প্রধান কারণ কবিতা এখন কেবলমাত্র শ্রাব্য নয় তা প্রধানত পাঠ্য। যে সুনিবিড় সুনিয়মিত ছন্দ আমাদের স্মৃতির সহায়তা করে তার অত্যাবশ্যকতা এখন আর নেই। একদিন খনার বচনে চাষবাসের পরামর্শ লেখা হয়েছিল ছন্দে। আজকালকার বাংলায় যে "কৃষ্টি" শব্দের উদ্ভব হয়েছে খনার এই সমস্ত কৃষির ছড়ায় তাকে নিশ্চিত এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধরণের কৃষ্টি প্রচারের ভার আজকাল গদ্য নিয়েছে। ছাপার অক্ষর তার বাহন, এই জন্যে ছন্দের পুঁটলিতে ঐ বচনগুলো মাথায় ক'রে বয়ে বেড়াবার দরকার হয় না। একদিন পুরুষও আপিসে যেত পাল্কিতে, মেয়েও সেই উপায়েই যেত শ্বশুরবাড়িতে। এখন রেলগাড়ির প্রভাবে উভয়ে একত্রে একই রথে জায়গা পায়। আজকাল গদ্যের অপরিহার্য্য প্রভাবের দিনে ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাবে কাব্যও আপন গতিবিধির জন্যে বাঁধাছন্দের ময়ূরপংখী-টাকে অত্যাবশ্যক ব'লে গণ্য করবে না। পূর্ব্বেই বলেছি

অমিত্রাক্ষর ছন্দে সব প্রথমে পাল্কির দরজা গেছে খুলে, তার ঘটাটোপ হয়েছে বর্জ্জিত। তবুও পয়ার যখন পংক্তির বেড়া ডিঙিয়ে চলতে সুরু করেছিল তখনো সাবেকি চালের পরিশেষরূপে গণ্ডির চিহ্ন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে রয়ে গেছে। ঠিক যেন পুরানো বাড়ির অন্দরমহল, তার দেয়ালগুলো সরানো হয় নি কিন্তু আধুনিককালের মেয়েরা তাকে অস্বীকার ক'রে অনায়াসে সদরে যাতায়াত করছে। অবশেষে হাল আমলের তৈরি ইমারতে সেই দেয়ালগুলো ভাঙা সুরু হয়েছে। চোদ্দো অক্ষরের গণ্ডি-ভাঙা পয়ার একদিন "মানসী"-র এক কবিতায় লিখেছিলুম, তার নাম "নিষ্ফল প্রয়াস"। অবশেষে আরো অনেক বছর পরে বেড়া-ভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল "বলাকা"-য়, "পলাতকা"-য়। এতে ক'রে কাব্যছন্দ গদ্যের কতকটা কাছে এল বটে, তবু মেয়ে কম্পার্টমেণ্ট রয়ে গেল, পুরাতন ছন্দোরীতির বাঁধন খুলল না। এমন কি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্য্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও প্রকাশ পায় নি। একটি প্রাকৃত ছন্দের শ্লোক উদ্ধৃত করি :—

বরস জল ভমই ঘন গঅন
সিঅল পবণ মণ হরণ
কণঅ পিঅরি ণচই বিজুরি ফুল্লিয়া ণীবা
পত্থর বিত্থর হিঅলা পিঅলা
ণ আবেই।

মাত্রা মিলিয়ে এই ছন্দ বাংলায় লেখা যাক্—

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
শীতল পবন বহে সঘনে,
কনক বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জ্জন করে,
নিষ্ঠুর অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।—

বাঙালি পাঠকের কান এ'কে রীতিমতো ছন্দ ব'লে মান্‌তে বাধা পাবে তাতে সন্দেহ নেই, কারণ এর পদ-বিভাগ প্রায় গদ্যের মতোই অসমান। যাই হোক্ এর মধ্যে একটা ছন্দের কাঠামো আছে—সেটুকুও যদি ভেঙে দেওয়া যায় তাহোলে কাব্যকেই কি ভেঙে দেওয়া হোলো? দেখা যাক্—

অবিরল ঝরছে শ্রাবণের ধারা,
বনে বনে সজল হাওয়া বয়ে চলেছে,
সোনার বরণ ঝলক দিয়ে নেচে উঠছে বিদ্যুৎ,
বজ্র উঠছে গর্জ্জন ক'রে।
নিষ্ঠুর আমার প্রিয়তম ঘরে এল না।

এ'কে বলতে হবে কাব্য, বুদ্ধির সঙ্গে এর বোঝাপড়া নয়, এ'কে অনুভব করতে হয় রসবোধে। সেই জন্যেই যতই সামান্য হোক, এর মধ্যে বাক্যসংস্থানের একটা শিল্পকলা শব্দব্যবহারের একটা "তেরচ্ছ চাহনি" রাখতে হয়েছে। সুবিহিত গৃহিণীপনার মধ্যে লোকে দেখতে পায় লক্ষ্মীশ্রী, বহু উপকরণে বহু অলঙ্কারে তার প্রকাশ নয়। ভাষার কক্ষেও অনতিভূষিত গৃহস্থালি গদ্য হোলেও তাকে সম্পূর্ণ গদ্য বলা চলবে না, যেমন চলবে না আপিসঘরের অসজ্জাকে অন্তঃপুরের সরল শোভনতার সঙ্গে তুলনা করা। আপিস ঘরে ছন্দটা প্রত্যক্ষই বর্জ্জিত, অন্যত্র ছন্দটা নিগূঢ় মর্ম্মগত, বাহ্য ভাষায় নয়, অন্তরের ভাবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে গদ্যে কাব্য রচনা করেছেন ওয়াল্‌ট্‌ হুইট্‌ম্যান। সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তার প্রভেদ নেই তবু ভাবের দিক থেকে তাকে কাব্য না ব'লে থাকবার জো নেই। এইখানে একটা তর্জ্জমা ক'রে দিই:—

লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে;
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে শ্যাওলা
পড়ছে ঝুলে।

কোনো দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে
তার খুসিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে
আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন ক'রে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুসিতে ভরা
আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর।
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলেম শ্যাওলা।
নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে;
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ঐ বন্ধুদের ছাড়া আর কোনো কথা আমার মনে
ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালোবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝলমল্ করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুসিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে
চিরজীবন ধ'রে,
তবু আমার মনে হয় আমি তো পারতুম না॥—

একদিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক

গাছ, একলা আপন আত্মসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময়, আর এক দিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা করছে প্রিয়সঙ্গের জন্যে, এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বলবার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন মনোভাবের একটি ইসারা আছে। একলা গাছের সঙ্গে তুলনায় একলা বিরহীহৃদয়ের উৎকণ্ঠা আভাসে জানানো হোলো, এই প্রচ্ছন্ন আবেগের ব্যঞ্জনা, এই তো কাব্য; এর মধ্যে ভাব-বিন্যাসের শিল্প আছে, তাকেই বলব ভাবের ছন্দ।

চীন কবিতার তর্জমা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেখাই :—

স্বপ্ন দেখলুম যেন চড়েছি কোন্ উঁচু ডাঙায়;
সেখানে দেখি গভীর এক ইঁদারা।
চলতে চলতে কণ্ঠ আমার শুকিয়েছে,
ইচ্ছে হোলো জল খাই।
ব্যগ্র দৃষ্টি নামিয়ে চাই ঠাণ্ডা সেই কুয়োর তলার দিকে।
ঘুরলেম চারদিকে, দেখলেম ভিতরে তাকিয়ে,
জলে পড়ল আমার ছায়া।
দেখি এক মাটির ঘড়া কালো সেই গহ্বরে;
দড়ি নাই যে তাকে টেনে তুলি।

ঘড়াটা পাছে তলিয়ে যায়
এই ভেবে প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হোলো।
পাগলের মতো ছুটলেম সহায় খুঁজতে।
গ্রামে গ্রামে ঘুরি, লোক নেই একজনো,
কুকুরগুলো ছুটে আসে টুঁটি কামড়ে ধরতে।
কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেম কুয়োর ধারে।
জল পড়ে দুই চোখ বেয়ে, দৃষ্টি হোলো অন্ধপ্রায়।
শেষকালে জাগলেম নিজেরই কান্নার শব্দে।
ঘর নিস্তব্ধ, স্তব্ধ সব বাড়ীর লোক ;
বাতির শিখা নিবো-নিবো, তার থেকে সবুজ
ধোঁয়া উঠ্‌ছে,
তার আলো পড়ছে আমার চোখের জলে।
ঘণ্টা বাজল, রাত দুপুরের ঘণ্টা,
বিছানায় উঠে বসলুম, ভাবতে লাগলুম অনেক কথা।

মনে পড়ল, যে ডাঙাটা দেখ্‌ছি সে চাং-আনের কবরস্থান ;
তিনশো বিঘে পোড়ো জমি,
ভারি মাটি তার, উঁচু উঁচু সব ঢিবি ;
নিচে গভীর গর্ত্তে মৃতদেহ শোওয়ানো।
শুনেছি মৃত মানুষ কখনো কখনো দেখা দেয় সমাধির বাইরে।
আজ আমার প্রিয় এসেছিল ইঁদারায় ডুবে-যাওয়া সেই ঘড়া,
তাই দুচোখ বেয়ে জল প'ড়ে আমার কাপড় গেল ভিজে ॥

এতে পদ্য ছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলঙ্করণ নেই তবুও আছে শিল্প।

উপসংহারে শেষকথা এই যে, কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হোতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা সুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়ে নি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যেপদ্যে রফানিষ্পত্তি চল্‌ছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। একালের খাতিরে অন্যকালকে অস্বীকার করা যায় না। *

১৩৪১

---

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত (১৩৪০)

ছন্দের মাত্রা

(১)

বহুকাল পূর্ব্বে একটি গান রচনা করেছিলেম, "সবুজপত্রে" সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল।

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

তা ছাড়া এই ছন্দে পরবর্ত্তী কালে দুই একটি শ্লোক লিখেছিলুম, যথা—

গোড়াতেই ঢাক বাজনা
কাজ করা তার কাজ না।

আর একটি—

শকতিহীনের দাপনি
আপনারে মারে আপনি।

বলা বাহুল্য এগুলি ৯-মাত্রার চালে লেখা।

"সবুজপত্রের" প্রবন্ধে তার পরে দেখিয়েছিলুম ধ্বনি-সংখ্যার কতরকম হেরফের ক'রে এই ছন্দের বৈচিত্র্য

ঘটতে পারে। অর্থাৎ তার চলন কত ভঙ্গীর হয়। তাতে যে-দৃষ্টান্ত রচনা করেছিলেম তার পুনরুক্তি না ক'রে নতুন বাণী প্রয়োগ করা যাক্।

এইখানে ব'লে রাখা ভালো এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলিতে প্রত্যেক ভাগে তাল দিলে ছন্দের পার্থক্য ধরা সহজ হয়।

উপরের ছন্দে ২+৩+২-এর লয়। নিচের ছন্দে ৩+২+৪-এর লয়।

আসন | দিলে | অনাহূতে |
ভাষণ | দিলে | বীণা-তানে, |
বুঝি গো | তুমি | মেঘদূতে |
পাঠায়ে | ছিলে | মোর পানে |
বাদল রাতি এল যবে
বসিয়াছিনু একা একা,
গভীর গুরু গুরু রবে
কী ছবি মনে দিল দেখা।
পথের কথা পূবে হাওয়া
কহিল মোরে থেকে থেকে ;—
উদাস হয়ে চলে-যাওয়া,
ক্ষ্যাপামি সেই রোধিবে কে।

আমার তুমি অচেনা যে
সে কথা নাহি মানে হিয়া,
তোমারে কবে মনোমাঝে
জেনেছি আমি না জানিয়া।
ফুলের ডালি কোলে দিনু,
বসিয়াছিলে একাকিনা,
তখনি ডেকে বলেছিনু,
তোমারে চিনি, ওগো চিনি

তার পরে ৪+৩+২ :—

বলেছিনু | বসিতে | কাছে, |
দেবে কিছু | ছিল না | আশা
দেবো ব'লে | যে-জন | যাচে |
বুঝিলে না | তাহারো | ভাষা
শুকতারা চাঁদের সাথী
বলে, "প্রভু, বেসেছি ভালো,
নিয়ে যেয়ো আমার বাতি
যেথা যাবে তোমার আলো।"
ফুল বলে, "দখিন হাওয়া,
বাঁধিব না বাহুর ডোরে,
ক্ষণতরে তোমারে পাওয়া,
চিরতরে দেওয়া যে মোরে॥"

তার পরে ৩+৬ :—

বিজুলী | কোথা হতে এলে,
          তোমারে | কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের | বুক চিরি গেলে
          অভাগা | মরে কেঁদে কেঁদে।
আগুনে গাঁথা মণিহারে
ক্ষণেক সাজায়েছ যারে
প্রভাতে মরে হাহাকারে
          বিফল রজনীর খেদে।

দেখা যাক্ ২+৫ :—

মোর বনে | ওগো গরবী, |
          এলে যদি | পথ ভুলিয়া |
তবে মোর | রাঙা করবী |
          নিজ হাতে | নিয়ো তুলিয়া |

আর একটা—

জলে ভরা | নয়ন-পাতে |
          বাজিতেছে | মেঘ-রাগিণী |
কা লাগিয়া | বিজনরাতে |
          উড়ে হিয়া, | হে বিরাগিণী

ম্লান মুখে | মিলাল হাসি |

গলে দোলে | নব মালিকা |

ধরাতলে | কী ভুলে আসি' |

সুর ভোলে | সুরবালিকা |

তার পরে ৪+৪+১—ব'লে রাখা ভালো, এই ছন্দটি পড়বার সময় সবশেষ ধ্বনিটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বারে বারে | যায় চলি | য়া, |

ভাসায় ন- | য়ননীরে | সে, |

বিরহের | ছলে ছলি | য়া |

মিলনের | লাগি ফিরে | সে |

যায় নয়নের আড়া-লে,

আসে হৃদয়ের মাঝে গো।

বাঁশিটিরে পায়ে মাড়া-লে

বুকে তা'র সুর বাজে গো।

ফুলমালা গেল শুকা-য়ে,

দীপ নিবে গেল বাতা-সে,

মোর ব্যথাখানি লুকা-য়ে

মনে তা'র রহে গাঁথা সে।

যাবার বেলায়, দুয়া-রে

তালা ভেঙে নেয় ছিনি-য়ে,

ফিরিবার পথ উহা-রে

ভাঙা দ্বার দেয় চিনি-য়ে॥

৩+২+৪-এর লয় পূর্ব্বে দেখানো হয়েছে, ৫+৪-এর লয় এখানে দেওয়া গেল ঃ—

আলো এল যে | দ্বারে তব |
ওগো মাধবী | বনছায়া |
দোঁহে মিলিয়া | নব নব |
তৃণে বিছালো | গাথো মায়া |
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ফেরে বাতাস কাছে কাছে ;
আজি ফাগুনে একসাথে
দোলা লাগিলো নাচে নাচে ॥
বধূ তোমার দেহলিতে
বর আসিছে দেখিছ কি।
আজি তাহার বাঁশরিতে
হিয়া মিলাবে দিবো সখি ॥

৬+৩-এর ঠাটেও ৯ মাত্রাকে সাজানো চলে, যেমন—

সেতারের তারে | ধানশী |
মীড়ে মীড়ে উঠে | বাজিয়া |
গোধূলির রাগে | মানসী |
সুরে যেন এল | সাজিয়া |

আর একটা ঃ—

তৃতীয়ার চাঁদ | বাঁকা সে,
আপনারে দেখে | ফাঁকা সে।

তারাদের পানে | তাকিয়ে |
কার নাম যায় | ডাকিয়ে |
সাথী নাহি পায় | আকাশে |

এতক্ষণ এই যে ৯ মাত্রার ছন্দটাকে নিয়ে নয়-ছয় করছিলুম সেটা বাহাদুরি করবার জন্যে নয়, প্রমাণ করবার জন্যে যে এতে বিশেষ বাহাদুরি নেই। ইংরেজি ছন্দে এক্‌সেণ্টের প্রভাব; সংস্কৃত ছন্দে দীর্ঘ-হ্রস্বের সুনির্দ্দিষ্ট ভাগ। বাংলায় তা নেই, এইজন্যে লয়ের দাবী রক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই। "জল পড়ে পাতা নড়ে" থেকে আরম্ভ ক'রে পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মাত্রা পর্য্যন্ত বাংলা ছন্দে আমরা দেখি। এই সুযোগে কেউ বল্‌তে পারেন এগারো মাত্রায় ছন্দ বানিয়ে নতুন কীর্ত্তি স্থাপন করব। আমি বলি তা করো কিন্তু পুলকিত হোয়ো না, কেননা, কাজটা নিতান্তই সহজ। দশ মাত্রার পরে আর একটা মাত্রা যোগ করা একেবারেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। যেমন—

চামেলির ঘন-ছায়া-বিতানে
বনবীণা বেজে ওঠে কী তানে।
স্বপনে মগন সেথা মালিনী
কুসুমমালায় গাঁথা শিখানে॥

অন্যরকমের মাত্রা ভাগ করতে চাও সেও কঠিন নয়, যেমন—

মিলন-সুলগনে | কেন বল |
নয়ন করে তোর | ছলছল |
বিদায় দিনে যবে | ফাটে বুক, |
সেদিনো দেখেছি তো | হাসিমুখ। |

তার পরে তেরো মাত্রার প্রস্তাবটা শুনতে লাগে খাপছাড়া এবং নতুন, কিন্তু পয়ার থেকে একমাত্রা হরণ করতে দুঃসাহসের দরকার হয় না, সে কাজ অনেকবার করেছি, তা নিয়ে নালিশ ওঠে নি। যথা, "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।" এক মাত্রা যোগ ক'রে পয়ারের জ্ঞাতিবৃদ্ধি করাও খুবই সহজ— যথা,

হে বীর, জীবন দিয়ে মরণেরে জিনিলে,
নিজেরে নিঃস্ব করি' বিশ্বেরে কিনিলে।

ষোলো মাত্রার ছন্দ দুর্লভ নয়,—অতএব দেখা যাক্ ১৭ মাত্রা ঃ—

নদী তীরে দুই | কূলে কূলে |
কাশবন দুলি | ছে |
পূর্ণিমা তারি | কূলে কূলে |
আপনারে ভুলি | ছে |

আঠারো মাত্রার ছন্দ সুপরিচিত, তার পরে উনিশ—

ঘন মেঘভার গগনতলে,
বনে বনে ছায়া তারি,
একাকিনী বসি' নয়নজলে
কোন বিরহিনী নারী ॥

তার পরে, কুড়ি মাত্রার ছন্দ সুপ্রচলিত। ২১ মাত্রা, যথা,

বিচলিত কেন মাধবী শাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থরথর,
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর ॥

তার পরে,—আর কাজ নেই। বোধ হয় যথেষ্ট প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।

সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরের পর্য্যায় বেঁধে তার সঙ্গীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনি-গুলিকে দুই মাত্রায় বিশ্লিষ্ট ক'রে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্য্যাদা

থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।—

যক্ষ সে কোনো জনা আছিল আনমনা, সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত, বরষকাল যাপে দুখতাপে।
নির্জ্জন রামগিরি-শিখরে মরে ফিরি একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা
যেথায় শীতল ছায় ঝরণা বহি যায় সীতার স্নানপূত জলধারা।
মাস পরে কাটে মাস, প্রবাসে করে বাস প্রেয়সী বিচ্ছেদে বিমলিন ;
কনক বলয়-খসা বাহুর ক্ষীণ দশা, বিরহ-দুখে হোলো বলহীন।
একদা আষাঢ় মাসে প্রথম দিন আসে, যক্ষ নিরখিল গিরিপর
ঘন ঘোর মেঘ এসে লেগেছে সানুদেশে, দন্ত হানে যেন করিবর॥

১৩৩৯

(২)

উপরের প্রবন্ধে লিখেছি "আঁধার রজনী পোহালো" গানটি নয়মাত্রার ছন্দে রচিত।

ছন্দতত্ত্বে প্রবীণ অমূল্যবাবু এর নয়মাত্রিকতার দাবী একেবারে নামঞ্জুর ক'রে দিলেন। আর কারো হাত থেকে এ রায় এলে তাকে আপিল করবার যোগ্য ব'লেও গণ্য করতুম না, এ ক্ষেত্রে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। রাস্তার লোক এসে যদি আমাকে বলে তোমার হাতে

পাঁচটা আঙুল নেই তাহোলে মনে উদ্বেগের কোনো কারণ ঘটে না। কিন্তু শারীরতত্ত্ববিদ্ এসে যদি এই সংবাদটা জানিয়ে যান তাহোলে দশবার ক'রে নিজের আঙুল গুণে দেখি, মনে ভয় হয় অঙ্ক বুঝি ভুলে গেছি। অবশেষে নিতান্ত হতাশ হয়ে স্থির করি, যে-কটাকে এতদিন আঙুল ব'লে নিশ্চিন্ত ছিলুম বৈজ্ঞানিক মতে তার সব কটা আঙুলই নয়, হয়তো শাস্ত্রবিচারে জানা যাবে যে, আমার আঙুল আছে মাত্র তিনটি, বাকি দুটো বুড়ো আঙুল আর ক'ড়ে আঙুল, তারা হরিজন শ্রেণীয়।

বর্ত্তমান তর্কে আমার মনে সেইরকম উদ্বেগ জন্মেছে। "আঁধার রজনী পোহাল" চরণের মাত্রাসংখ্যা যেদিক থেকে যেমন ক'রে গ'ণে দেখি নয়মাত্রায় গিয়ে ঠেকে। অমূল্যবাবু বললেন, এটা তো নয়মাত্রার ছন্দ নয়ই, বাংলা ভাষায় আজো নয়মাত্রার উদ্ভব হয় নি, হয়তো নিরবধি-কালে কোনো এক সময়ে হোতেও পারে। তিনি বলেন, বাংলা ছন্দ দশমাত্রাকে মেনেছে নয়মাত্রাকে মানে নি। এ কথায় আরো আমার ধাঁধা লাগল।

অমূল্যবাবু পরীক্ষা ক'রে বলছেন, এ ছন্দে জোড়ের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, "আঁধার রজনী" পর্য্যন্ত এক পর্ব্ব,

এইখানে একটা ফাঁক, তারপরে "পোহাল" শব্দে তিন-মাত্রার একটা পঙ্গুপর্ব্বাঙ্গ, তারপরে পূরো যতি। অর্থাৎ এ ছন্দে ছয়মাত্রারই প্রাধান্য। এর ধড়টা ছয়মাত্রার, ল্যাজটা তিনমাত্রার। চোখ দিয়ে এক পংক্তিতে নয়-মাত্রা দেখা যাচ্চে বটে কিন্তু অমূল্যবাবুর মতে কান দিয়ে দেখলে ওর দুটো অসমান ভাগ বেরিয়ে পড়ে।

এর থেকে বোঝা যাচ্চে আমার অঙ্কবিদ্যায় আমি যে সংখ্যাকে ৯ বলি, অমূল্যবাবুর অঙ্কশাস্ত্রেও তাকেই ৯ বলে বটে কিন্তু ছন্দের মাত্রা নির্ণয়সম্বন্ধে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতির মূলেই প্রভেদ আছে। কথাটা পরিষ্কার ক'রে নেওয়া ভালো।

পৃথিবী চলছে,—তার একটা ছন্দ আছে। অর্থাৎ তার গতিকে মাত্রাসংখ্যায় ভাগ করা যায়। এই ছন্দের পূর্ণায়তনকে নির্ণয় করব কোন্ লক্ষণ মতে? পৃথিবী নিয়মিত কালে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে ১লা বৈশাখ থেকে আরম্ভ ক'রে চৈত্র-সংক্রান্তিতে তার আবর্ত্তনের একপর্য্যায় শেষ হয়, তারপরে আবার সেই পরিমিতকালে ১লা বৈশাখ থেকে পুনর্ব্বার তার আবর্ত্তন সুরু হয়। এই পুনরাবর্ত্তনের

দিকে লক্ষ্য ক'রে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণের মাত্রাসংখ্যা ৩৬৫ দিন।

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

এই ছন্দের মাত্রাপথে পুনরাবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে কোথায় সে তো জানা কথা,—সেই অনুসারে সর্ব্বজনে ব'লে থাকে এর মাত্রাসংখ্যা চোদ্দো। বলা বাহুল্য এই চোদ্দোমাত্রা একটা অখণ্ড নিরেট পদার্থ নয়। এর মধ্যে জোড় দেখা যায়, সেই জোড় আটমাত্রার অবসানে, অর্থাৎ "মহাভারতের কথা" একটুখানি দাঁড়িয়েছে যেখানে এসে। পয়ারে এই দাঁড়াবার আড্ডা দু'-জায়গায়, প্রথম আট ধ্বনিমাত্রার পরে ও শেষার্দ্ধের ছয় ধ্বনিমাত্রার ও দুই যতিমাত্রার শেষে। পৃথিবীর প্রদক্ষিণ ছন্দের মধ্যেও দুইভাগ আছে—উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। যতিসমেত ষোলোমাত্রা পয়ারেও তেমনি আছে উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ, কিন্তু সেই দুটিভাগ সমগ্রেরই অন্তর্গত।

মহাভারতের বাণী
অমৃত সমান মানি,
কাশিরাম দাস ভনে
শোনে তাহা সর্ব্বজনে।

যদিও পয়ারের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবু এ'কে অন্য ছন্দ বলব, কারণ এর পুনরাবর্ত্তন আটমাত্রায়, ষোলোমাত্রায় নয়।

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পূরিল পুলকে।

এই ছন্দের আবর্ত্তন ছয়মাত্রার পর্য্যায়ে ঘটে না, তার কক্ষপথ সম্পূর্ণ হয়েছে ৯ মাত্রায়। নয় মাত্রায় তার প্রদক্ষিণ নিজেকে বারে বারে বহুগুণিত করছে। এই নয় মাত্রায় মাঝে মাঝে সমভাগে জোড়ের বিচ্ছেদ আছে। সেই জোড় ছয় মাত্রায় না, তিনমাত্রায়।

এই ছন্দের লক্ষণ কী, প্রশ্নের উত্তর এই যে, এর পূর্ণভাগ নয়মাত্রা নিয়ে, আংশিক ভাগ তিন, এবং সেই প্রত্যেক ভাগের মাত্রাসংখ্যা তিন। কোনো পাঠক যদি ছয়মাত্রার পরে এসে হাঁফ ছাড়েন, তাঁকে বাধা দেবার কোনো দণ্ডবিধি নেই, সুতরাং সেটা তিনি নিজের স্বচ্ছন্দেই করবেন, আমার ছন্দে করবেন না। আমার ছন্দের লক্ষণ এই—প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় তিনমাত্রা। অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি ৯। অমূল্যবাবু এটিকে নিয়ে যে ছন্দ বানিয়েছেন তার প্রত্যেক পদে দুই কলা। প্রথম

কলার মাত্রাসংখ্যা ছয়, দ্বিতীয় কলার তিন, অতএব সমগ্র পদের মাত্রাসমষ্টি ৯। দুটি ছন্দেরই মোট আয়তন একই হবে, কানে শোনাবে ভিন্নরকম।

ছান্দসিক যাই বলুন এখানে ছন্দরচয়িতা হিসাবে আমার আবেদন আছে। ছন্দের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমি যা বলি সেটা আমার অশিক্ষিত বলা, সুতরাং তাতে দোষ স্পর্শ করতে পারে; কিন্তু ছন্দের রসসম্বন্ধে আমি যদি কিছু আলোচনা করি, সঙ্কোচ করব না, কেননা ছন্দ-সৃষ্টিতে অশিক্ষিতপটুত্বের মূল্য উপেক্ষা করবার নয়। "আঁধার রজনী পোহাল" রচনাকালে আমার কান যে আনন্দ পেয়েছিল সেটা অন্য ছন্দোজনিত আনন্দ থেকে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। কারণটা বলি।

অন্যত্র বলেছি দুই মাত্রায় স্থৈর্য্য আছে, কিন্তু বেজোড় ব'লেই তিনমাত্রা অস্থির। ত্রৈমাত্রিক ছন্দে সেই অস্থিরতার বেগটাকে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

> বিংশতি কোটি মানবের বাস
> এ ভারতভূমি যবনের দাস
> রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাধা।

এ ছন্দে শব্দগুলি পরস্পরকে অস্থিরভাবে ঠেলা

দিচ্চে। এ'কে জোড়মাত্রার ছন্দে রূপান্তরিত করা যাক্।

যেথায় ত্রিংশতি কোটি মানবের বাস
সেই গো ভারতভূম যবনের দাস
শৃঙ্খলেতে বাঁধা পড়ে আছে ॥

এর চালটা শান্ত।

আলোচ্য নয়মাত্রার ছন্দে তিন সংখ্যার অস্থিরতা শেষ পর্যন্তই রয়ে গেছে। সেটা উচিত নয়, ছয়মাত্রার পরে থামবার একটুখানি অবকাশ দেওয়া ভালো এমন তর্ক তোলা যেতে পারে। কিন্তু ছন্দের সিদ্ধান্ত তর্কে হয় না, ওটার মীমাংসা কানে। সৌভাগ্যক্রমে এ সভায় সুযোগ পেয়েছি কানের দরবারে আর্জি পেশ করবার। নবমাত্রার চঞ্চল ভঙ্গীতে কান সায় দিচ্চে না, এ কথা যদি সুধীজন বলেন, তাহোলে অগত্যা চুপ করে যাব কিন্তু তবুও নিজের কানের প্রাকৃতিকে অশ্রদ্ধা করতে পারব না।

"আঁধার রজনী পোহাল" কবিতাটি গানরূপে রচিত। সঙ্গীতাচার্য্য ভীমরাও শাস্ত্রী মৃদঙ্গের বোলে

এ'কে যে-তালের রূপ দিয়েছিলেন তাতে দুটি আঘাত এবং একটি ফাঁক। যথা—

১ ২ ০
আঁধার | রজনী | পোহাল |

এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, ফাঁকটা তালের শেষ ঝোঁক, তারপরে পুনরাবর্ত্তন। এই গানের স্বাভাবিক ঝোঁক প্রত্যেক তিন মাত্রায়,এবং এর তালের অর্থাৎ ছন্দের সম্পূর্ণতা তিন মাত্রাঘটিত তিনভাগে। অমূল্যবাবু বা শৈলেন্দ্রবাবু যদি অন্য কোনো রকমের ভাগ ইচ্ছা করেন তবে রচয়িতার ইচ্ছার সঙ্গে তার ঐক্য হবে না এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নাই।

উত্তর দিগন্ত ব্যাপি' দেবতাত্মা হিমাদ্রি বিরাজে
দুই প্রান্তে দুই সিন্ধু মানদণ্ড যেন তারি মাঝে।

এই ছন্দকে আঠারোমাত্রা যখন বলি তখন সমগ্র পদের মাত্রাসংখ্যা গণনা ক'রেই ব'লে থাকি, আট মাত্রার পরে এর একটা সুস্পষ্ট বিরাম আছে ব'লেই এর আঠারো মাত্রার সীমানার বিরুদ্ধে নালিশ চলে না।

আমাদের হাতে তিন পর্ব্ব আছে। মণিবন্ধ পর্য্যন্ত এক, এটি ছোটো পর্ব্ব, কনুই পর্য্যন্ত দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত তিন, যাকে আমরা সমগ্র বাহু বলি সে এই

তিন পর্ব্ব মিলিয়ে। আমাদের দেহে এক বাহু অন্য বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ রূপকল্প অর্থাৎ প্যাটার্ণ্ আছে। ছন্দোবদ্ধ কাব্যে সেই প্যাটার্ণকেই পুনঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্ণের সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব্ব পর্ব্বাঙ্গ প্রভৃতি যা-কিছু। সেই সমগ্র প্যাটার্ণের মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা। "আঁধার রজনী পোহাল" গানটিকে এই জন্যেই নয়মাত্রার বলেছি। যেহেতু প্রত্যেক নয়মাত্রাকে নিয়েই তার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।

কোন্ ছত্র কী রকম ভাগ ক'রে পড়তে হবে, এ নিয়ে মতান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। পুরাতন ছন্দগুলির নাম অনুসারে সংজ্ঞা আছে। নতুন ছন্দের নামকরণ হয় নি। এই জন্যে তার আবৃত্তির কোনো নিশ্চিত নির্দ্দেশ নেই। কবির কল্পনা এবং পাঠকের রুচিতে যদি অনৈক্য হয় তবে কোনো আইন নেই যা নিয়ে নালিশ চলতে পারে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, আমি যখন স্পষ্টতই আমার কোনো কাব্যের ছন্দকে নয়-মাত্রার বলছি তখন সেটা অনুসরণ করাই বিহিত। হোতে পারে তাতে কানের তৃপ্তি হবে না। না যদি হয় তবে সে দায় কবির। কবিকে নিন্দা করবার অধিকার

সকলেরই আছে, তার রচনাকে সংশোধন করবার অধিকার কারো নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা বানানো নয়। পার্লামেণ্টে দর্শকদের বসবার আসনে ছুটি শ্রেণীভাগ আছে। সম্মুখ ভাগের আসনে বসেন যাঁরা খ্যাতনামা, পশ্চাতের ভাগে বসেন অপর সাধারণ। ছুই বিভাগের মাঝখানে কেবল একটি মাত্র দড়ি বাঁধা। একজন ভারতীয় দর্শক সেই সামনের দিক নির্দ্দেশ ক'রে প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "Can I go over there?" প্রহরী উত্তর করেছিল, "Yes, sir, you can, but you mayn't."

ছন্দেও যতিবিভাগ সম্বন্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে can-এর নিষেধ বলবান নয় কিন্তু তবু may-র নিষেধ স্বীকার্য্য। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। পাঠকমণ্ডলে স্বনামখ্যাত পয়ার ছন্দের একটা পাকা পরিচয় আছে, এই জন্যে তার পদে কোথায় আধা যতি কোথায় পূরো যতি তা নিয়ে বচসার আশঙ্কা নেই। নিম্নলিখিত কবিতার চেহারা অবিকল পয়ারের। সেই চোখের দলিলের জোরে তার সঙ্গে পয়ারের চালে ব্যবহার অবৈধ হয় না—

মাথা তুলে তুমি যবে চলো তব রথে
তাকাও না কোথা আমি ফিরি পথে পথে,
          অবসাদজাল মোরে ঘেরে পায় পায়।
মনে পড়ে এই হাতে নিয়েছিলে সেবা,
তবু হায় আজ মোরে চিনিলে না কেবা,
          তোমারি চাকার ধূলা মোরে ঢেকে যায়॥

কিন্তু যদি পয়ার নাম বদলিয়ে এর নাম দেওয়া যায় ষড়ঙ্গী এবং এর যথোচিত সংজ্ঞা নির্দেশ করি তাহোলে বিনা প্রতিবাদে নিম্নলিখিত ভাগেই এ'কে পড়া উচিত হবে।

মাথা তুলে তুমি
          যবে চলো তব
                    রথে
তাকাও না কোথা
          আমি ফিরি পথে
                    পথে,
অবসাদজাল
          ঘেরে মোরে পায়ে
                    পায়

মনে পড়ে এই
হাতে নিয়েছিলে
সেবা,
তবু হায় আজ
মোরে চিনিবে সে
কেবা,
তোমারি চাকার
ধুলা মোরে ঢেকে
যায়।

এর প্রত্যেক পদে ১৪ মাত্রা, তিন কলা, সেই কলার মাত্রা সংখ্যা যথাক্রমে ৬, ৬, ২।

অমূল্যবাবুর মতে বাংলায় নয়মাত্রার ছন্দ নেই, আছে দশ মাত্রার, কিন্তু দশ মাত্রার ঊর্দ্ধে আর ছন্দ চলে না। আমি অনেক চিন্তা ক'রেও তাঁর এই মতের তাৎপর্য্য বুঝতে পারি নি। একাদিক্রমে মাত্রাগণনা গণিতশাস্ত্রের সবচেয়ে সহজ কাজ, তাতেও যদি তিনি বাধা দেন তাহোলে বুঝতে হবে তাঁর মতে গণনার বাইরে আরো কিছু গণ্য করবার আছে। হয়তো মোট মাত্রার ভাগগুলো নিয়ে তর্ক। ভাগ সকল ছন্দেই আছে।

দশ মাত্রার ছন্দ, যথা—

প্রাণে মোর আছে তার বাণী,
তার বেশি তারে নাহি জানি।

এর সহজ ভাগ এই—

প্রাণে মোর | আছে তার
বাণী।

একে অন্য রকমেও ভাগ করা চলে, যথা—

প্রাণে মোর আছে
তার বাণী।

অথবা "প্রাণে" শব্দটাকে একটু আড় ক'রে রেখে—

প্রাণে মোর আছে তার বাণী।

এই তিনটেই দশ মাত্রার ছন্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তা হোলেই দেখা যাচ্ছে ছন্দকে চিনতে হোলে প্রথম দেখা চাই তার পদের মোট মাত্রা, তার পরে তার কলাসংখ্যা, তার পরে প্রত্যেক কলার মাত্রা।

১ ২ ৩ ৪
সকল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়,

এই ছন্দের প্রত্যেক পদে ১৭ মাত্রা। এর ৪ কলা। অন্ত্য কলাটিতে ২ ও অন্য তিনটি কলায় পাঁচ পাঁচ মাত্রা।

এই ১৭ মাত্রা বজায় রেখে অন্য জাতীয় ছন্দ রচনা চলে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা। যথা—

১ ২ ৩
মন চায় | চলে আসে | কাছে,
৪ ৫
তবুও পা | চলে না |
বলিবার | কত কথা | আছে, |
তবু কথা | বলে না |

এ ছন্দে পদের মাত্রা ১৭, কলার সংখ্যা পাঁচ তার মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে ৪।৪।২।৪।৩।

আঠারোমাত্রার দীর্ঘ পয়ারে প্রথম আট মাত্রার পরে যেমন স্পষ্ট যতি আছে, এই ছন্দের প্রথম দশ মাত্রার পরে তেমনি।

নয়নে | নিঠুর | চাহনি |
হৃদয়ে | করুণা | ঢাকা |
গভীর | প্রেমের | কাহিনী |
গোপন | করিয়া | রাখা |

এরও পদের মাত্রা ১৭, কলার সংখ্যা ৬, শেষ কলাটি ছাড়া প্রত্যেক কলার মাত্রা ৩।

১ ২ ৩ ৪
অন্তর ভাব | কী বলিতে চায় | চঞ্চল চর | ণে
কণ্ঠের হার | নয়ন ডুবায় | চম্পক বর | ণে।

এরও সমগ্র পদের মাত্রা ১৭। এর চারটি কলা। প্রথম তিনটি কলায় মাত্রা সংখ্যা ৬, চতুর্থ কলায় ১। ১৭ মাত্রার ছন্দকে কলাবৈচিত্র্যের দ্বারা আরো নব নব রূপ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাক্ষী আর বাড়াবার দরকার নেই।

শেষের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেছে তাতে মাত্রাসংখ্যা গণনা উপলক্ষ্যে "চরণে" শব্দকে ভাগ ক'রে দিয়ে এক-মাত্রার "ণে" ধ্বনিকে স্বতন্ত্র কলায় বসিয়েছি। ওটা যে স্বতন্ত্র কলাভুক্ত তার প্রমাণ এই ছন্দের তাল দেবার সময় ঐ "ণে" ধ্বনিটির উপর তাল পড়ে।

ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র একটি নয়মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবার সময় নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যবহার করেছি। তাল দেবার রীতি বদল ক'রে এ'কে দুরকম ক'রে পড়া যায়, দুটোই পৃথক ছন্দ।

বারে বারে যায় | চলিয়া |
ভাসায় গো আঁখি | নীরে সে।
বিরহের ছলে | ছলিয়া
মিলনের লাগি | ফিরে সে॥

এটা ৯ মাত্রার শ্রেণীর ছন্দ ; এর দুই কলা এবং কলাগুলি ত্রৈমাত্রিক।

এর পদকে তিন কলায় ভাগ ক'রে কলাগুলিকে দুই মাত্রার ছাঁদ দিলে এই একই ছড়া সম্পূর্ণ নূতন ছন্দে গিয়ে পৌঁছাবে। যথা—

১ ২ ৩
বারে বারে | যায় চলি | যা
ভাসায় গো | আঁখি নীরে | সে
বিরহের | ছলে ছলি | যা
মিলনের | লাগি ফিরে | সে।
সারাদিন দহে হিয়া যা,
কারেক না দেখি উছারে।
অসময়ে ল'য়ে কী আশা
অকারণে আসে দুয়ারে।

অমূল্যবাবু বলেন, এর প্রথম দুই কলায় চার চার আট এবং শেষের কলায় একমাত্রার ছন্দ কৃত্রিম শুনতে হয়। বোধ হয় অখণ্ড শব্দকে খণ্ডিত করা হচ্চে

ব'লে তাঁর কাছে এটা কৃত্রিম ঠেক্‌ছে। কিন্তু ছন্দের ঝোঁকে অখণ্ড শব্দকে দুভাগ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরকম তর্কে বিশুদ্ধ হাঁ এবং না-এর দ্বন্দ্ব, কোনো পক্ষে কোনো যুক্তি প্রয়োগের ফাঁক নেই। আমি বলছি কৃত্রিম শোনায় না, তিনি বলছেন শোনায়। আমি এখনো বলি, এই রকম কলাভাগে এই ছন্দে একটি নূতন নৃত্য ভঙ্গী জেগে ওঠে, তার একটা রস আছে।

দশের বেশি মাত্রাভার বাংলা ছন্দ বহন করতে অক্ষম একথা মানতে পারব না। নিম্নে বারো মাত্রার একটি শ্লোক দেওয়া গেল—

> মেঘ ডাকে গম্ভীর গরজনে
> ছায়া নামে তমালের বনে বনে
> ঝিল্লি ঝনকে নীপ-বীথিকায়।
> সরোবর উচ্ছল কলে কলে,
> তটে তালি বেণুশাখা তলে তলে
> মেতে ওঠে বর্ষণ-গীতিকায়।

শ্রোতারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আবৃত্তিকালে পদান্তের পূর্ব্বে কোনো যতিই দিই নি, অর্থাৎ বারোমাত্রা একটি ঘনিষ্ঠ গুচ্ছের মতোই হয়েছে। এই পদগুলিকে

বারোমাত্রার পদ বলবার কোনো বাধা আছে ব'লে আমি কল্পনা করতে পারি নে। উল্লিখিত শ্লোকের ছন্দে বারোমাত্রা, প্রত্যেক পদে তিন কলা, প্রত্যেক কলায় চার মাত্রা। বারোমাত্রার পদকে চার কলায় বিভক্ত ক'রে ত্রৈমাত্রিক করলে আরেক ছন্দ দেখা দেবে, যথা—

শ্রাবণ গগন, ঘোর ঘনঘটা,
তাপসী যামিনী এলায়েছে জটা,
দামিনী ঝলকে রহিয়া রহিয়া।

এ ছন্দ বাংলা ভাষায় সুপরিচিত।

তমাল বনে ঝরিছে বারিধারা,
তড়িৎ ছুটে আঁধারে দিশাহারা।
ছিঁড়িয়া ফেলে কিরণ কিঙ্কিণী
আত্মঘাতী যেন সে পাগলিনী॥

পঞ্চমাত্রাঘটিত এই বারোমাত্রাকেও কেন যে বারোমাত্রা ব'লে স্বীকার করব না, আমি বুঝতেই পারি নে।

কেবল নয়মাত্রার পদ বলার দ্বারা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়, সে পরিচয় বিশেষ ভাবে সম্পূর্ণ হয় না। আমার সাধারণ পরিচয় আমি ভারতীয়,

বিশেষ পরিচয় আমি বাঙালি, আরও বিশেষ পরিচয় আমি বিশেষ পরিবারের বিশেষ নামধারী মানুষ। নয়মাত্রার পদবিশিষ্ট ছন্দ সাধারণভাবে অনেক হোতে পারে।

আরো বিশেষ পরিচয় দাবী করলে এর কলাসংখ্যা এবং সেই কলার মাত্রাসংখ্যার হিসাব দিতে হয়।

কোনো কোনো ছন্দে কলাবিভাগ করতে ভুল হবার আশঙ্কা আছে। যেমন—গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা। পয়ারের ১৪ মাত্রা থেকে এক মাত্রা হরণ ক'রে এই ১৩ মাত্রার ছন্দ গঠিত, অর্থাৎ "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরিষণ" এবং এই ছন্দটি বস্তুতঃ এক, এমন মনে হোতে পারে। আমি তা স্বীকার করি নে, তার সাক্ষী শুধু কান নয় তালও বটে। এই দুটি ছন্দে তালের ঘা পড়েছে কী রকম তা দেখা উচিত।

১ ২

গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরিষণ |

সাধারণ পয়ারের নিয়মে এতে দুটি আঘাত।

১ ২ ৩

গগনে গরজে মেঘ | ঘন বর | ষা |

এতে তিনটি আঘাত। পদটি তিন অসমান ভাগে

বিভক্ত। পদের শেষ বর্ণে স্বতন্ত্র ঝোঁক দিলে তবেই এর ভঙ্গীটাকে রক্ষা করা হয়। 'বরষা' শব্দের শেষ আকার যদি হরণ করা যায় তাহোলে ঝোঁক দেবার জায়গা পাওয়া যায় না, তাহোলে অক্ষরসংখ্যা সমান হোলেও ছন্দ কাৎ হয়ে পড়ে।

"আঁধার রজনী পোহাল" পদের অন্তবর্ণে দীর্ঘস্বর আছে কিন্তু নয়মাত্রার ছন্দের পক্ষে সেটা অনিবার্য্য নয়, তারি একটি প্রমাণ নিচে দেওয়া গেল—

জ্বেলেছে পথের আলোক
সূর্য্য রথের চালক,
অরুণরক্ত গগন।
বক্ষে নাচিছে রুধির
কে রবে শান্ত সুধীর,
কে রবে তন্দ্রামগন।
বাতাসে উঠিছে হিল্লোল,
সাগর ঊর্ম্মি বিলোল,
এল মহেন্দ্রলগন,
কে রবে তন্দ্রানিমগন॥

এই তর্কক্ষেত্রে আর একটি আমার কৈফিয়ৎ দেবার আছে। অমূল্যবাবুর নালিশ এই যে, ছন্দের দৃষ্টান্তে

কোনো কোনো স্থলে দুই পংক্তিকে মিলিয়ে আমি কবিতার এক পদ ব'লে চালিয়েছি। আমার বক্তব্য এই, লেখার পংক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে ব'লে আমরা প্রয়োজনমতে পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে এক পা ব'লেই স্বীকার করি এবং অনুভব ক'রে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দেও ঠিক তাই।

"সকলবেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়"।

অমূল্যবাবু এ'কে দুই চরণ বলেন, আমি বলি নে। এই দু'টি ভাগকে নিয়েই ছন্দের সম্পূর্ণতা। যদি এমন হোত—

সকলবেলা কাটিয়া গেল
বকুলতলে আসিল মেলা

তাহোলে নিঃসংশয়ে এ'কে দুই চরণ বলতুম।

পুনর্ব্বার বলি যে, যে-বিরামস্থলে পৌঁছিয়ে পদ্যছন্দ অনুরূপভাগে পুনরাবর্ত্তন করে, সেই পর্য্যন্ত এসে তবেই কোনটা কোন ছন্দ এবং তার মাত্রার পরিমাণ কত তার

নির্ণয় সম্ভব, মাঝখানে কোনো একটা জোড়ের মুখে গণনা শেষ করা অসঙ্গত। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দঃ-শাস্ত্রে এই নিয়মেরই অনুসরণ করা হয়। দৃষ্টান্ত—

[পৈঙ্গল ছন্দঃ সূত্রাণি]

ভঞ্জিঅ মলঅ চোলবই নিবলিঅ
গঞ্জিঅ গুজ্জরা।
মালব রাঅ মলয়গিরি লুক্কিঅ
পরিহরি কুংজরা।
খুরাসান খুহিঅ রণমহ মুহিঅ
লংঘিঅ সাঅরা।
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ
রিউগণহ কাঅরা।

গ্রন্থকার বলছেন "বিংশত্যক্ষরাণি" এবং "পঞ্চ-বিংশতিমাত্রাঃ প্রতিপাদং দেয়াঃ"। এর পদে পদে কুড়িটি অক্ষর ও পাঁচশটা মাত্রা,—ছন্দের এই পরিচয়।

পঢম দহ দিজ্জিআ
পুণ বি তহ কিজ্জিআ
পুণ বি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।
ইম পরিবি বিহুদল
সত্ত সত ভাস পল
এত্ত কহু ঝুল্লণা ণাঅরাআ ॥

ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই—প্রথমং দশমাত্রা দীয়ন্তে। অর্থাৎ তত্র বিরতিঃ ক্রিয়তে। পুনরপি তথা কর্ত্তব্যা। পুনরপি সপ্তদশ মাত্রাসু বিরতির্জাতা চ। অনয়ৈব রীত্যা দলদ্বয়েপি মাত্রা সপ্তত্রিংশৎ পতন্তি।

এমনি ক'রে দলগুলিকে মিলিয়ে যে ছন্দের সাঁইত্রিশ মাত্রা "তামিমাং নাগরাজঃ পিঙ্গলো ঝুল্লাণা-মিতি কথয়তি।" আমি যাকে ছন্দবিশেষের রূপকল্প বা প্যাটার্ণ বলছি ঝুল্লণা ছন্দে সেইটে সাঁইত্রিশ মাত্রায সম্পূর্ণ, তার পরে তার অনুরূপ পুনরাবৃত্তি।

অমূল্যবাবু হয়তো এর কলাগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে এ'কে পাঁচ বা দশমাত্রার ছন্দ বলবেন কিন্তু পাঁচ বা দশ-মাত্রায় এর পদের সম্পূর্ণতা নয়। যার ভাগগুলি অসমান এমন ছন্দ দেখা যাক—

কুণ্ডু অক নলুনক
ছঅনক গঅনক
ছকলু বিবিপা
একলেণে—

এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "দ্বাত্রিংশন্মাত্রা পাদেষু প্রসিদ্ধা।"

এই ছন্দকে বাংলায় ভাঙতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়—

কুঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে
চলিয়াছে সখীসাথে—
মল্লিকা কলিকার
মাল্য হাতে।

চার পংক্তিতে এই ছন্দের পূর্ণরূপ এবং সেই পূর্ণরূপের মাত্রাসংখ্যা বত্রিশ। ছন্দে মাত্রা গণনার এই ধারা আমি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য মনে করি—মনে নেই আমার কোনো পূর্ব্বতম প্রবন্ধে অন্য মত প্রকাশ করেছি কি না। যদি ক'রে থাকি তবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সবশেষে পুনরায় বলি, ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে হোলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা, তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য্য, যথা—

বর্ষণ-শান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি' মনে এল নীপরেণুগন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

এখানে চারিটি পদ এবং প্রত্যেক পদ নানা অসমান মাত্রায় রচিত—সমস্তটাকে নিয়ে ছন্দের রূপকল্প। বিশেষ জাতীয় ছন্দে এইরূপ পদ ও মাত্রা গণনাতেও আমি পিঙ্গলাচার্য্যের অনুবর্ত্তী।

১৩৪১

ছন্দের হসন্ত হলন্ত

(১)

আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমরা ছন্দ রচনা করি স্বতই কানের ওজন রেখে, বাজারে প্রচলিত কোনো বাইরের মানদণ্ডের দ্বারা মেপে মেপে এ কাজ করিনে, অন্তত সজ্ঞানে নয়। কিন্তু ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন এই ব'লে আমাদের দোষ দিয়েছেন যে, আমরা একটা কৃত্রিম মানদণ্ড দিয়ে পাঠকের কানকে ফাঁকি দিয়ে তার চোখ ভুলিয়ে এসেছি। আমরা ধ্বনি চুরি ক'রে থাকি অক্ষরের আড়ালে।

ছন্দোবিৎ কী বল্‌ছেন ভালো ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা যাক্‌। তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে কিছু লাইন তুলে চিহ্নিত ক'রে দৃষ্টান্ত স্বরূপে ব্যবহার করেছেন। যথা—

+ । + । ।
উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।

+ ।
মোর চিত্ত মাঝে,

+
চির-নূতনেরে দিল ডাক

। +
পঁচিশে বৈশাখ।

তিনি বলেন, "এখানে দণ্ডচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে এক ব'লে ধরা হয়েছে কারণ এগুলি শব্দের মধ্যে অবস্থিত, আর যোগচিহ্নিত যুগ্মধ্বনিগুলিকে দুই ব'লে ধরা হয়েছে, যেহেতু এগুলি শব্দের অন্তে অবস্থিত।" অর্থাৎ উদয়-এর অয় হয়েছে দুই মাত্রা অথচ দিগন্ত-এর অন্ হয়েছে একমাত্রা,—এইজন্যে উদয় শব্দকেও তিন মাত্রা এবং দিগন্ত শব্দকেও তিন মাত্রা গণনা করা হয়েছে। "যুগ্মধ্বনি" শব্দটার পরিবর্ত্তে ইংরেজি সিলেব্‌ল্ শব্দ ব্যবহার করলে অনেকের পক্ষে সহজ হবে। আমি তাই করব।

বহুকাল পূর্ব্বে একদিন বাংলার শব্দ-তত্ত্ব আলোচনা করেছিলুম। সেই প্রসঙ্গে ধ্বনি-তত্ত্বের কথাও মনে উঠেছিল। তখন দেখেছিলুম বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্চে

বাংলায় হসন্ত শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর অ এবং চাঁ-এর আ আমরা দীর্ঘ ক'রে টেনে পরবর্ত্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ ক'রে থাকি। জল এবং জলা, চাঁদ এবং চাঁদা শব্দের তুলনা করলে এ কথা ধরা পড়বে। এ সম্বন্ধে বাংলার বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ববিৎ সুনীতিকুমারের বিধান নিলে নিশ্চয়ই তিনি আমার সমর্থন করবেন। বাংলায় ধ্বনির এই নিয়ম স্বাভাবিক ব'লেই আধুনিক বাঙালি কবি ও ততোধিক আধুনিক বাঙালি ছন্দোবিৎ জন্মাবার বহু পূর্ব্বেই বাংলা ছন্দে প্রাক্-হসন্ত স্বরকে দুই মাত্রার পদবী দেওয়া হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত কোনো বাঙালির কানে ঠেকেনি—এই প্রথম দেখা গেল নিয়মের ধাঁধায় প'ড়ে বাঙালি পাঠক কানকে অবিশ্বাস করলেন। কবিতা লেখা সুরু করবার বহু-পূর্ব্বে সবে যখন দাঁত উঠেছে তখন পড়েছি "জল পড়ে, পাতা নড়ে।" এখানে "জল" যে "পাতার" চেয়ে মাত্রাকৌলীন্যে কোনো অংশে কম এমন সংশয় কোনো বাঙালি শিশু বা তার পিতামাতার কানে বা মনেও উদয় হয়নি। এইজন্যে ঐ দুটো কথা অনায়াসে এক পংক্তিতে ব'সে গেছে, আইনের ঠেলা খায়নি। ইংরেজি মতে "জল"

সর্ব্বত্রই এক সিলেব্‌ল্‌, "পাতা" তার ডবল্‌ ভারী। কিন্তু জল শব্দটা ইংরেজি নয়। কাশীরাম নামের কাশী এবং রাম যে একই ওজনের এ কথাটা কাশী-রামের স্বজাতীয় সকলকেই মানতেই হয়েছে। "উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে" এই লাইনটা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত প্রবোধচন্দ্র ছাড়া আর কোনো পাঠকের কিছু-মাত্র খট্‌কা লেগেছে ব'লে আমি জানিনে—কেননা তারা সবাই কান পেতে পড়েছে, নিয়ম পেতে নয়। যদি কর্ত্তব্যবোধে নিতান্তই খট্‌কা লাগা উচিত হয় তাহোলে সমস্ত বাংলা কাব্যের পনেরো আনা লাইনের এখনি প্রুফ সংশোধন করতে বসতে হবে।

লেখক আমার একটা মস্ত ফাঁকি ধরেছেন। তিনি বলেন, আমি ইচ্ছামতো কোথাও "ঐ" লিখি কোথাও লিখি "ওই"—এই উপায়ে পাঠকের চোখ ভুলিয়ে অক্ষরের বাটখারার চাতুরীতে একই উচ্চারণকে জায়গা বুঝে দুই রকমের মূল্য দিয়েছি।

তাহোলে গোড়াকার ইতিহাসটা বলি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতায় এক একটি অক্ষর এক সিলেব্‌ল্‌ ব'লেই চল্‌ত। অথচ সেদিন কোনো কোনো ছন্দে

যুগ্মধ্বনিকে দ্বৈমাত্রিক ব'লে গণ্য করার দরকার আছে ব'লে অনুভব করেছিলুম।

আকাশের দুই আলোর কাঁপন
নয়নেতে এই লাগে,
সেই মিলনের তড়িত তাপন
নিখিলের রূপে জাগে।

আজকের দিনে এমন কথা অতি অর্ব্বাচীনকেও বলা অনাবশ্যক যে, ঐ ত্রৈমাত্রিক ভূমিকার ছন্দকে নিচের মতো রূপান্তরিত করা অপরাধ,—

ঐ যে নভস্তলের রশ্মির কম্পন
এই মস্তিষ্কেতে লাগে,
সেই সম্মিলনে বিদ্যুৎ ঝম্পন
বিশ্বমূর্ত্তি ধরে জাগে।

অথচ সেদিন "বৃত্রসংহারে" এই জাতীয় ছন্দে হেমচন্দ্র ঐন্দ্রিলার রূপবর্ণনায় অসঙ্কোচে লিখতে পেরেছিলেন—"বদনমণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া"।

বেশ মনে আছে সেদিন স্থানবিশেষে "ঐ" শব্দের বানান নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছিল। প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয় বলবেন "ভেবে যা হয় একটা স্থির ক'রে ফেলাই ভালো ছিল। কোথাও বা "ঐ" কোথাও বা

"ওই" বানান কেন ?" তার উত্তর এই, বাংলার স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা সংস্কৃতের মতো বাঁধা নিয়ম মানে না—ওর মধ্যে অতি সহজেই বিকল্প চলে। "ও—ই দেখো, খোকা ফাউন্টেন পেন মুখে পূরেছে" এখানে দীর্ঘ ওকারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি বলি, "ঐ দেখো, ফাউন্টেন পেন্‌টা খেয়ে ফেল্‌লে বুঝি" তখন হ্রস্ব ঐকার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না। বাংলা উচ্চারণে স্বরের ধ্বনিতে টান দিয়ে অতি সহজেই বাড়ানো কমানো যায় ব'লেই ছন্দে তার গৌরব বা লাঘব নিয়ে আজ পর্যান্ত দলাদলি হয়নি।

এ সব কথা দৃষ্টান্ত না দিলে স্পষ্ট হয় না, তাই দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হোলো।

> মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
> নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।
> দোঁহার তরুণ প্রাণ বেঁধে দিল গন্ধে
> আলোয় আঁধারে মেশা নিভৃত আনন্দে।

এখানে "দুই" "জুঁই" আপন আপন উকারকে দীর্ঘ ক'রে দুই সিলেব্‌লের টিকিট পেয়েছে, কান তাদের

সাধুতায় সন্দেহ করলে না, দ্বার ছেড়ে দিলে। উল্টো দৃষ্টান্ত দেখাই :—

এই যে এল সেই আমারি স্বপ্নে-দেখা রূপ,
কই দেউলে দেউটি দিলি, কই জ্বালালি ধূপ।
যায় যদি রে যাক না ফিরে চাই নে তারে রাখি,
সব গেলেও হায় রে তবু স্বপ্ন র'বে বাকি।

এখানে এই সেই কই যায় হায় প্রভৃতি শব্দ এক সিলেব্‌লের বেশি মান দাবী করলে না। বাঙালি পাঠক সেটাকে অন্যায় না মনে ক'রে সহজ ভাবেই নিলে।

কাঁধে মই, বলে, "কই ভুঁই চাঁপা গাছ।"
দই-ভাঁড়ে ছিপ ছাড়ে, খোঁজে কই মাছ।
ঘুঁটে ছাই মেখে লাউ বাঁধে ঝাউ শাখা,
কী খেতাব দেব ভাব ঘুরে যায় মাথা॥

এখানে "মই" "কই" "ভুঁই" "দই" "ছাই" "লাউ" প্রভৃতি সকলেরই সমান দৈর্ঘ্য—যেন গ্র্যানেডিয়ারের সৈন্যদল। যে-পাঠক এটা প'ড়ে দুঃখ পান নি সেই পাঠককেই অনুরোধ করি, তিনি প'ড়ে দেখুন :—

দুইজনে জুঁই তুলতে যখন
গেলেম বনের ধারে,
সন্ধ্যা-আলোর মেঘের ঝালর
ঢাকল অন্ধকারে।

কুঞ্জে গোপন গন্ধ বাজায়
নিরুদ্দেশের বাঁশি,
দোঁহার নয়ন খুঁজে বেড়ায়
দোঁহার মুখের হাসি ॥

এখানে যুগ্মধ্বনিগুলো এক সিলেব্‌লের চাকার গাড়িতে অনায়াসে ধেয়ে চলেছে। চণ্ডীদাসের গানে রাধিকা বলেছেন "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো"—বাঁশিধ্বনির এই তো ঠিক পথ, নিয়মের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করলে মরমে পৌঁছত না। কবিরাও সেই কান লক্ষ্য ক'রে চলেন, নিয়ম যদি চৌমাথার পাহারওয়ালার মতো সিগ্‌ন্যাল তোলে তবু তাঁদের রুখতে পারে না।

আমার দুঃখ এই, তথাচ আইনবিৎ বল্‌ছেন যে, লিপিপদ্ধতির দোষে "অক্ষর গুণে ছন্দ রচনার অন্ধ অভ্যাস" আমাদের পেয়ে বসেছে। আমার বক্তব্য এই যে, ছন্দ রচনার অভ্যাসটাই অন্ধ অভ্যাস। অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সঙ্কেতে সে চলতে পারে,—কবিরও সেই দশা। তা যদি না হোত তা হোলেই পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গ'ণে গ'ণে চল্‌তে হোত।

"বৎসর" "উৎসব" প্রভৃতি খণ্ড ৎ-ওয়ালা কথা-গুলোকে, আমরা ছন্দের মাপে বাড়াই কমাই,—এ রকম চাতুরী সম্ভব হয় যে-হেতু খণ্ডৎকে কখনো আমরা চোখে দেখার সাক্ষ্যে এক অক্ষর ধরি আবার কখনো কানে শোনার দোহাই দিয়ে তাকে আধ অক্ষর ব'লে চালাই, প্রবন্ধলেখক এই অপবাদ দিয়েছেন। অভিযোগকারীর বোঝা উচিত এটা একেবারেই অসম্ভব, কেননা ছন্দের কাজ চোখ ভোলানো নয়, কানকে খুসি করা, সেই কানের জিনিষে ইঞ্চিগজের মাপ চলেই না। বৎসর প্রভৃতি শব্দ গেঞ্জি জামার মতো, মধুপুরের স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় দেহ এক আধ ইঞ্চি বাড়লেও চলে আবার সহরে এসে এক আধ ইঞ্চি কম্‌লেও সহজে খাপ খেয়ে যায়। কান যদি সম্মতি না দিত তাহোলে কোনো কবির সাধ্য ছিল না ছন্দ নিয়ে যা খুসি তাই করতে পারে।

বৎসরে বৎসরে হাঁকে কালের গোমায়ু
যায় আয়ু, যায় আয়ু, যায় যায় আয়ু।

এখানে বৎসর তিনমাত্রা। কিন্তু সেতারে মীড় লাগাবার মতো অল্প একটু টান্‌লে বেসুর লাগে না।

যথা—

> সভাসনে উৎসবে বৎসর যায়
> শেষে ম্লান দিবসের ক্ষুৎপিপাসায়।
> ফাল্গুনের দিনশেষে মউমাছি ও যে
> মধুহীন বনে বৃথা মাধবীরে খোঁজে ॥

টান কমিয়ে দেওয়া য'ক্,

> উৎসবের রাত্রিশেষে মৃৎপ্রদীপ হায়
> তারকার মৈত্রী ছেড়ে মৃত্তিকারে চায়।

দেখা যাচ্চে এটুকু কমি-বেশিতে মামলা চলে না, বাংলা ভাষার স্বভাবের মধ্যেই যথেষ্ট প্রশ্রয় আছে। যদি লেখা যেত—

> সভাসনে মহোৎসবে বৎসর যায়—

তাহোলে নিয়ম বাঁচত ; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ওকারের সঙ্গে খণ্ড ৎ মিলে একমাত্রা, কিন্তু কর্ণধার বলছে ঐখানটায় তরণী যেন একটু কাৎ হয়ে পড়ল। আমি এক জায়গায় লিখেছি "উদয়-দিক্প্রান্ততলে।"—ওটাকে ব'দ্‌লে "উদয়ের দিক্প্রান্ততলে" লিখলে কানে খারাপ শোনাত না একথা প্রবন্ধলেখক বলেছেন, শালিসির জন্যে কবিদের উপর বরাৎ দিলুম।

তব চিত্ত গগনের দূর দিক্-সীমা
বেদনার রাঙা মেঘে পেয়েছে মহিমা।

এখানে দিক্ শব্দের ক হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও তাকে একমাত্রার পদবী দেওয়া গেল। নিশ্চিত জানি পাঠক সেই পদবীর সম্মান স্বতই রক্ষা ক'রে চলবেন।

মনের আকাশে তা'র দিক্‌সীমানা বেয়ে
বিবাগী স্বপন পাখী চলিয়াছে ধেয়ে।

অথবা

দিগ্-বলয়ে নব শশিলেখা
টুকরো যেন মাণিকের রেখা।

এতেও কানের সম্মতি আছে।

দিক্‌প্রান্তে ওই চাঁদ বুঝি
দিক্-ভ্রান্ত মরে পথ খুঁজি'।

আপত্তির বিশেষ কারণ নেই।

দিক্-প্রান্তের ধূমকেতু উন্মত্তের প্রলাপের মতো
নক্ষত্রের আঙিনায় টলিয়া পড়িল অসঙ্গত।

এও চলে। একের নজিরে অন্যের প্রামাণ্য ঘোচে না।

কিন্তু যাঁরা এ নিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা একটা কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ মনে রাখছেন না যে, সব দৃষ্টান্তগুলিই পয়ার জাতীয় ছন্দের। আর এ কথা

বলাই বাহুল্য যে এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে একমাত্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন অধিকার পেয়েছে। আবার যুক্ত-ধ্বনিকে দুইভাগে বিশ্লিষ্ট ক'রে তাকে দুই মাত্রায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবী করতে পারে না তাও নয়।

এখনি আসিলাম দ্বারে
অমনই ফিরে চলিলাম,
চোখও দেখেনি কভু তারে
কানই শুনিল তার নাম।

"তোমারি" "যখনি" শব্দগুলির ইকারকে বাংলা বানানে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ক'রে লেখা হয়, সেই সুযোগ অবলম্বন ক'রে কোনো অলস কবি ওগুলোকে চার মাত্রার কোঠায় বসিয়ে ছন্দ ভরাট করেছেন কি না জানিনে, যদি ক'রে থাকেন বাঙালি পাঠক তাঁকে শিরোপা দেবে না। ওদের উকিল তখন বৎসর উৎসব দিক্‌প্রান্ত প্রভৃতি শব্দগুলির নজির দেখিয়ে তর্ক করবে। তার একমাত্র উত্তর এই যে, কান যেটাকে মেনে নিয়েছে কিম্বা মেনে নেয়নি, চোখের সাক্ষ্য নিয়ে কিম্বা বাধা নিয়মের দোহাই দিয়ে সেখানে তর্ক তোলা

অগ্রাহ্য। যে-কোনো কবি উপরের ছড়াটাকে অনায়াসে বদল ক'রে লিখ্‌তে পারে,—

> এখনি আসিনু তার দ্বারে
> অমনি ফিরিয়া চলিলাম।
> চোখেও দেখিনি কভু তারে
> কানেই শুনেছি তার নাম।

বৎসর উৎসব প্রভৃতি শব্দ যদি তিন মাত্রার কোঠা পেরোতে গেলেই স্বভাবতই খুঁড়িয়ে পড়ত তাহোলে তার স্বাভাবিক ওজন বাঁচিয়ে ছন্দ চালানো এতই দুঃসাধ্য হোত না যে, ধ্বনিকে এড়িয়ে অক্ষর গণনার আশ্রয়ে শেষে মান বাঁচানো আবশ্যক হোত। ওটা চলে ব'লেই চালানো হয়েছে, দায়ে প'ড়ে না। কেবল অক্ষর সাজিয়ে অচল রীতিকে ছন্দে চালানো যদি সম্ভব হোত তাহোলে খোকাবাবুকে কেবল লম্বা টুপি পরিয়ে দাদামশায় ব'লে চালানো অসাধ্য হোত না।

১৩৩৮

(২)

দিলীপকুমার আশ্বিনের "উত্তরায়" ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েছেন। সর্ব্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েছেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে

কথা বলতে চেয়েছি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েছেন যে, নিম্নলিখিত কবিতায় আমি "একেকটি" শব্দটাকে চার-মাত্রার ওজন দিয়েছি—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমতো
গল্প লিখি একেকটি ক'রে।

এদিকে নীরেনবাবুর রচনায় "একটি কথা একবার হয় কলুষিত" পদটিতে "একটি" শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করিনি ব'লে তিনি দ্বিধা বোধ করছেন। তর্ক না ক'রে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

একটি কথার লাগি তিনটি রজনী জাগি
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে, মুখে নানা কথা ওঠে,
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

"একটি" "তিনটি" "একটু" শব্দগুলি হসন্তমধ্য, "গোলমাল" "তোলপাড়"-ও সেই জাতের। অথচ হসন্তের ধ্বনি-লাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিনমাত্রাও চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন, কেবলমাত্র অক্ষর

গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েছে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাদে লেখা যেত তাহোলেই ছন্দে ধ্বনির কম্‌তি ধরা পড়ত। আমার বক্তব্য এই যে, চোখ দিয়ে ছন্দ পড়া আর বাইসিক্‌লের চাকা দিয়ে তামাগুড় দেওয়া একই কথা, ওটা হবার জো নেই। বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে :—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আট্‌কে যাবে কাল।

ব'লে রাখা ভালো এটা ভিষক-ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন নয়, সাহিত্য-ডাক্তারের বানানো ছড়া, ছন্দ-সম্বন্ধে মত-সংশয় নিবারণের উদ্দেশে,—এর থেকে অন্য কোনো রোগের প্রতিকার কেউ যেন আশা না করেন।

আরো একটা :—

একটি কথা শুনিবারে তিনটে রাত্রি মাটি।
এর পরে ঝগড়া হবে শেষে দাঁত্‌কপাটি॥

অথবা

একটি কথা শোনো, মনে খট্‌কা নাহি রেখে,
টাট্‌কা মাছ জুট্‌ল না তো, সুট্‌কি দেখো চেখে।

শেষের তিনটি ছড়ায় অক্ষর গুণতি করতে গেলে দৃশ্যত

পয়ারের সীমা ছাড়িয়ে যায় কিন্তু তাই ব'লেই যে পয়ার ছন্দের নির্দ্দিষ্ট ধ্বনি বেড়ে গেল তা নয়। আপাতত মনে হয় এটা যথেচ্ছাচার। কিন্তু হিসাব ক'রে দেখলেই দেখা যাবে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি। কেননা তার জো নেই। এ তো রাজত্ব করা নয় কবিত্ব করা, এখানে লক্ষ্য হোলো মনোরঞ্জন; খামকা একটা জবরদস্তির আইন জারি ক'রে তারপরে পাহারাওয়ালা লাগিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। ধ্বনির বাজো গোঁয়ার্ত্তমি ক'রে কেউ জিতে যাবে এমন সাধ্য আছে কার? চব্বিশ ঘণ্টা কান রয়েছে সতর্ক।

আমি এই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করছি যে, আক্ষরিক ছন্দ ব'লে কোনো অদ্ভুত পদার্থ বাংলায় কিম্বা অন্য কোনো ভাষাতেই নেই। অক্ষর ধ্বনির চিহ্নমাত্র। যেমন জল শব্দটাকে দিয়ে জল পদার্থটার প্রতিবাদ চলে না, অক্ষরকে ধ্বনির প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো তেমনি বিড়ম্বনা।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয় তাহোলে খোঁড়া হসন্ত-বর্ণকে কখনো আধমাত্রা কখনো পূরোমাত্রার পদবীতে বসানো হয় কেন? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, স্বয়ং ভাষা যদি নিজেই আসন পেতে দেয় তবে তার উপরে

অন্য কোনো আইন চলে না। ভাষাও বর্ণভেদে পংক্তির ব্যবস্থা নিজের ধ্বনির নিয়ম বাঁচিয়ে তবে করতে পারে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ ব'লেই গণ্য করি। তাতে ধ্বনিরসের বৈচিত্র্য হয়। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি "এইরে", আবার তাকে টান্‌লে ডবল ক'রে বলতে পারি "এ-ইরে"। তার কারণ আমাদের স্বরবর্ণগুলো জীবধর্ম্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সঙ্কোচন প্রসারণ চলে। চারটে পাথরের মূর্ত্তি ধরাবার মতো জায়গায় পাঁচটা ধরাতে গেলে মুস্কিল বাধে; কিন্তু চারজন প্যাসেঞ্জার বসাবার বেঞ্চিতে পাঁচ-জন মানুষ বসালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই যদি তারা পরস্পর রাজি থাকে। বাংলা ভাষার স্বরবর্ণগুলিও পাথুরে নয়, নিজের স্থিতিস্থাপকতার গুণে তারা প্রতিবেশীর জন্যে একটু আধটু জায়গার ব্যবস্থা করতে সহজেই রাজি থাকে। এই জন্যেই অক্ষরের সংখ্যা গণনা ক'রে ছন্দের ধ্বনিমাত্রা গণনা বাংলায় চলে না। এটা বাঙালির আত্মীয়সভার মতন। সেখানে যতগুলো চৌকি তার চেয়ে মানুষ বেশি থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, অথবা

পাশে ফাঁক পেলে দুইজনের জায়গা একজনে হাত পা মেলে আরামে দখল করাও এই জনতার অভ্যাস্ত। বাংলার প্রাকৃতছন্দ ধ'রে তার প্রমাণ দেওয়া যাক্,—

> বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান,
> শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোওয়ায় সের-ওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোওয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের।

> বৃষ্টি। পড়ে-। টাপুর। টুপুর। নদেয়। এল। বা-ন।
> শিবঠা। কুরের। বিয়ে-। হবে-। তিনক। ন্যে। দা-ন।

দেখা যাচ্ছে, তিন গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্ত্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত ক'রে সেই পোড়ো জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে। এত সহজে যে, হাজার হাজার ছেলে মেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্ত্তে তাদের কারো কণ্ঠ স্খলিত হয়নি। ফাঁকগুলো যদি ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন—দোহাই দিচ্ছি, না করেন যেন—তবে এই রকম দাঁড়াবে ঃ—

> বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা,
> শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

রামপ্রসাদের একটি গান আছে :—

মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখ-বাঁধা বলদের মতো।

এটাও তিন মাত্রা লয়ের ছন্দ।

মা -আ। মায় ঘু। রাবি -। কত -।

ফাঁক ভরাট করতে হোলে হবে এই চেহারা :—

হে মাতা আমারে ঘুরাবি কতই
চক্ষু-বদ্ধ বৃষের মতোই।

যাঁরা অক্ষর গণনা ক'রে নিয়ম বাঁধেন তাঁদের জানিয়ে রাখা ভালো যে, স্বরবর্ণে টান দিয়ে মীড় দেবার জন্যেই প্রাকৃত বাংলা ছন্দে কবিরা বিনা দ্বিধায় ফাঁক রেখে দেন, সেই ফাঁকগুলো ছন্দেরই অঙ্গ—সে সব জায়গায় ধ্বনির বেশ কিছু কাজ করবার অবকাশ পায়।

"হারিয়ে ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে।

এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেক যতিতে ফাঁক আছে।

১ ২ ৩ ৪
হারিয়ে ফেলা—। বাঁশি আমা-র। পালিয়েছিল—। বুঝি—।

৫ ৬
লুকোচুরি-র। ছলে—।

কিছু বৈচিত্র্যও দেখছি। প্রথম দুটি বিভাগে সমান্তরাল

ফাঁক। কিন্তু তিনের ভাগে ফাঁক বাদ গিয়ে একেবারে চতুর্থভাগের শেষে দীর্ঘ ফাঁক পড়েছে। পাঠক "হারিয়ে ফেলার" পরেও ফাঁক না দিয়ে একেবারে দ্বিতীয় ভাগের শেষে যদি সেটা পূরণ ক'রে দেন তবে ভালোই শুনতে হবে।

কিন্তু যদি বেফাঁক ঠাস্-বুনানির বিশেষ ফরমাস থাকে তাহোলে সেটাও চেষ্টা করলে মন্দ হবে না ঃ—

স্বপ্ন আমার বন্ধনহারা সন্ধ্যাতারার সঙ্গী
মরণ যাত্রা মেলে,
স্বর্ণবরণ কন্থটিকায় অস্ত-শিখর লঙ্ঘি'
লুকায় মৌনতলে ॥

এই কথাটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, হসন্তবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে মাত্রাই থাক্ পাঠ করতে বাঙালি পাঠকের একটুও বাধে না, ছন্দের ঝোঁক আপনিই অবিলম্বে তাকে ঠিকমতো চালনা করে।

পাংলা করিয়া কাটো কাংলা মাছেরে,
উৎসুক নাংনি যে চাহিয়া আছেরে।

এই ছড়াটা পড়তে গেলে বাঙালি নিঃসংশয়ে সহজ

খণ্ড ত-এর পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণকে দীর্ঘ ক'রে পড়বে। আবার যেম্‌নি নিম্নের ছড়াটি সামনে ধরো—

> পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে বাংলা মাছটিরে
> টাটকা তেলে ফেলে দাও শর্ষে আর জিরে,
> ভেট্‌কি যদি জোটে তাতে মাখো লঙ্কা বাটা,
> যত্ন ক'রে বেছে ফেলো টুকরো যত কাঁটা—

অমনি প্রাক্-হসন্ত স্বরগুলিকে ঠেসে দিতে এক মুহূর্ত্তও দোষ হবে না। এই যে বাংলা স্বরবর্ণের সজীবতা, এ'কে কোনো কড়া নিয়মের চাপে আড়ষ্ট ক'রে তাকে সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যবহারযোগ্য করা উচিত—এ মত চালালে বাংলাভাষাকে ফাঁকি দেওয়া হবে। শুক্‌নো আমসত্ত্বের মধ্যেই সাম্য, কিন্তু সরস আমের মধ্যে বৈচিত্র্য, ভোজে কোন্‌টার দাম বেশি তা নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক।

বাংলা প্রাকৃত ভাষার কাব্যে স্বরধ্বনির যে প্রাণবান স্বচ্ছন্দতা আছে সংস্কৃত বাংলা ভাষা,—যাকে আমরা সাধুভাষা বলি,—তার মধ্যে প'ড়ে সে কেন জেনানা মেয়ের মতো দেয়ালে আট্‌কা পড়ে গেল? তার কারণ সংস্কৃত-বাংলা কৃত্রিম ভাষা, ওখানে বাইরের নিয়মের প্রাধান্য, তার আপন নিয়ম অনেক জায়গায়

কুণ্ঠিত। সভাস্থলে একটি আসনে একটি মানুষের স্থান নির্দ্দিষ্ট, কারো বা দেহ ক্ষীণ, আসনে ফাঁক থেকে যায়, কারো বা স্থূল দেহ, আসনে ঠেসে বসতে হয়—কিন্তু গোণাগণতি চৌকি, সীমা নির্দ্দিষ্ট। যদি ফরাসে বসতে হোত তাহোলে কলেবরের তারতম্য ধ'রে পরস্পরের আসনের সীমানায় কমি-বেশি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘট্‌ত। কিন্তু সভ্যতার মর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি রেখে স্বভাবের নিয়মকে বাধা নিয়মে পাকা ক'রে দিতে হয়। তাতে কিছু পীড়ন ঘটলেও গাম্ভীর্য্যের পক্ষে তার একটা সার্থকতা আছে। সেই জন্যেই সভার রীতি ও ঘরের রীতিতে কিছু ভেদ থাকেই। শকুন্তলার বাকল দেখে দুষ্মন্ত বলেছিলেন, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতী-নাম্—কিন্তু যখন তাঁকে রাজান্তঃপুরে নিয়েছিলেন তখন তাঁকে নিশ্চয়ই বাকল পরান নি। তখন শকুন্তলার স্বাভাবিক শোভাকে অলঙ্কৃত করেছিলেন, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্যে নয়, মর্য্যাদারক্ষার জন্যে। রাজরাণীর সৌন্দর্য্য ব্যক্তিবিশেষে বিচিত্র, কিন্তু তাঁর মর্য্যাদার আদর্শ সকল রাজরাণীর মধ্যে এক। ওটা প্রকৃতির হাতে তৈরি নয় রাজসমাজের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ ওটা প্রাকৃত নয় সংস্কৃত। তাই দুষ্মন্ত স্বীকার করেছিলেন বটে বন-

লতার দ্বারা উদ্যানলতা পরাভূত তবু উদ্যানকে বনের আদর্শে রমণীয় ক'রে তুল্‌তে নিশ্চয় তাঁর সাহস হয়নি। তাই আমি নিজে আকন্দফুল ভালোবাসি কিন্তু আমার সাধুসমাজের মালী ঐ গাছের অঙ্কুর দেখবামাত্র উপ্‌ড়ে ফেলে। সে যদি কবি হোত, সাধু ভাষায় ছাড়া কবিতা লিখত না। সাধুভাষার ছন্দের বাঁধারীতি যে-জাতীয় ছন্দে চলে এবং শোভা পায় সে হচ্চে পয়ার জাতীয় ছন্দ। এখানে ফাঁক ফাঁক নির্দ্দিষ্ট আসনের উপর নানা ওজনেরই ধ্বনিকে চড়ানো নিরাপদ। এখানে ঠিক চোদ্দোটা অক্ষরকে বাহন ক'রে যুগ্ম অযুগ্ম নানা রকমের ধ্বনিই একত্র সভা জমাতে পারে।

কাব্যলীলা একদিন যখন সুরু করেছিলেম তখন বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষারই ছিল একাধিপত্য। অর্থাৎ তখন ছিল কাটা কাটা পিঁড়িতে ভাগ-করা ছন্দ। এই আইনের অধীনে যতক্ষণ পয়ারের এলাকায় থাকি ততক্ষণ আসনপীড়া ঘটে না। কিন্তু তিনমাত্রামূলক ছন্দের দিকে আমার কলমের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। ঐ ছন্দে প্রত্যেক অক্ষরে স্বতন্ত্র আরূঢ় সকল ওজনের ধ্বনিকেই সমানদরের একক ব'লে ধ'রে নিতে বারম্বার কানে বাজত। সেইজন্যে যুক্ত অক্ষর অর্থাৎ

যুগ্মধ্বনি বর্জ্জন করবার একটা দুর্ব্বল অভ্যাস আমাকে ক্রমেই পেয়ে বস্‌ছিল। ঠোকর খাবার ভয়ে পদগুলোকে একেবারে সমতল ক'রে যাচ্ছিলুম। সব জায়গায় পেরে উঠিনি কিন্তু মোটের উপর চেষ্টা ছিল। "ছবি ও গান"-এ "বাস্তব প্রেম" কবিতা পড়লে দেখা যাবে, যুক্ত অক্ষর ঝেঁটিয়ে দেবার প্রয়াস আছে তবু তা'রা পাথরের টুকরোর মতো রাস্তার মাঝে মাঝে উঁচু হয়ে রইল। তাই যখন লিখেছিলুম :—

কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তারে রবো আঁকড়িয়া
লৌহ শৃঙ্খলের ডোর

মনে খট্‌কা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয় নি—কিন্তু তখন কলম ছিল অপটু এবং অলস মন ছিল অসতর্ক। কেননা পাঠকদের তরফ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না। তখন ছন্দের সদর রাস্তাও গ্রাম্য রাস্তার মতো এবড়ো খেবড়ো থাকত, অভ্যাসের গতিকে কেউ সেটাকে নিন্দনীয় ব'লে মনেও করেনি।

অক্ষরের দাসত্বে বন্দী ব'লে প্রবোধচন্দ্র বাঙালি কবিদেরকে যে দোষ দিয়েছেন সেটা এই সময়কার পক্ষে কিছু অংশে খাটে। অর্থাৎ অক্ষরের মাপ সমান রেখে

ধ্বনির মাপে ইতরবিশেষ করা তখনকার শৈথিল্যের দিনে চল্‌ত, এখন চলে না। তখন পয়ারের রীতি সকল ছন্দেরই সাধারণ রীতি ব'লে সাহিত্যসমাজে চলে গিয়েছিল। তার প্রধান কারণ, পয়ার জাতীয় ছন্দই তখন প্রধান, অন্য জাতীয় অর্থাৎ ত্রৈমাত্রিক ছন্দের ব্যবহার তখন অতি অল্পই। তাই এই মাইনরিটির স্বতন্ত্র দাবী সেদিন বিধিবদ্ধ হয়নি।

তারপরে "মানসী" লেখার সময় এল। তখন ছন্দের কান আর ধৈর্য্য রাখতে পারছে না। একথা তখন নিশ্চিত বুঝেছি যে, ছন্দের প্রধান সম্পদ যুগ্মধ্বনি, অথচ এটাও জানছি যে পয়ার সম্প্রদায়ের বাইরে নির্ব্বিচারে যুগ্মধ্বনির পরিবেষণ চলে না। "রয়েছি পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা" এ লাইন-বেচারাকে পয়ারের বাঁধা প্রথাটা শৃঙ্খল হয়েই বেঁধেছে, তিনমাত্রার স্কন্ধকে চারমাত্রার বোঝা বইতে হচ্চে। সেই "মানসী" লেখবার বয়সে আমি যুগ্মধ্বনিকে দুই মাত্রার মূল্য দিয়ে ছন্দ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

প্রথম প্রথম পয়ারেও সেই নিয়ম প্রয়োগ করে-ছিলুম। অনতিকাল পরেই দেখা গেল তার প্রয়োজন নেই। পয়ারে যুগ্মধ্বনির উপযুক্ত ফাঁক যথেষ্ট আছে।

(এই প্রবন্ধে আমি ত্রিপদী প্রভৃতি পয়ার জাতীয় সমস্ত দ্বৈমাত্রিক ছন্দকেই পয়ার নাম দিচ্ছি।)

পয়ারে ধ্বনিবিন্যাসের এই যে স্বচ্ছন্দতা, দুই মাত্রার লয় তার একমাত্র কারণ নয়। পয়ারের পদগুলিতে তার ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য একটা মস্ত কথা। সাধারণ ভাগ হচ্ছে ৩+৩+২+৩+৩ যথা :—

উজ্জ্বল আকাশ ভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশিরমাঝে খুঁজিল প্রতিমা।

অন্য রকম, যথা

[illegible]
[illegible]

অথবা

[illegible]
সেই যাহা [illegible]

অথবা

সারা নিশীথের [illegible] কিছু আর,
[illegible] কারাগারে হারাবে কি [illegible]।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন হয়েছে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো

বহুগ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না ক'রেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হোলে সে পদ্য হোলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো, যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে ধ্বনির বোঝা হাল্কা। যুগ্মবর্ণের ভার চাপানো যাক্—

সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জ প্রাঙ্গণে
মন্দার মঞ্জরী তোলে চঞ্চল কঙ্কণে।
বেণীবন্ধ তরঙ্গিত কোন্ ছন্দ নিয়া,
স্বর্ণবীণা গুঞ্জরিছে তাই সন্ধানিয়া।

আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘপয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা। তার প্রথম যতি পদের মাঝখানে আট অক্ষরের পরে, শেষ যতি দশ অক্ষরের পরে পদের শেষে। এতেও নানাপ্রকারের ভাগ চলে। তাই অমিত্রাক্ষরের লাইন-ডিঙোনো চালে এর ধ্বনিশ্রেণীকে নানারকমে কুচ-কাওয়াজ করানো যায়।

হিমাদ্রির ধ্যানে যাহা। স্তব্ধ হয়ে ছিল রাত্রিদিন
সপ্তর্ষির দৃষ্টিতলে। বাক্যহীন স্তব্ধতায় লীন,
সেই নির্ঝরিণী ধারা। রবিকর স্পর্শে উচ্ছ্বসিতা
দিগ্দিগন্তে প্রচারিছে। অন্তহীন আনন্দের গীতা॥

বাংলায় এই আর একটি গুরুভারবহ ছন্দ। এরা সবাই মহাকাব্য বা আখ্যান বা চিন্তাগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বাহন। ছোটো পয়ার আর এই বড়ো পয়ার, বাংলা কাব্যে এরা যেন ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা আর ঐরাবত। অন্তত এই বড়ো পয়ারকে গীতিকাব্যের কাজে খাটাতে গেলে বেমানান হয়। এর নিজের গড়নের মধ্যেই একটা সমারোহ আছে সেইজন্যে এর প্রয়োজন সমারোহসূচক ব্যাপারে।

ছোটো পয়ারকে চেঁচে ছুলে হাল্কা কাজে লাগানো যায় যেমন বাঁশের কঞ্চিকে ছিপ করা চলে। পয়ারের দেহ-সংস্থানেই গুরুর সঙ্গে লঘুর যোগ আছে। তার প্রথম অংশে আট, দ্বিতীয় অংশে ছয়—অর্থাৎ হালের দিকে সে চওড়া কিন্তু দাঁড়ের দিকে সরু—তাকে নিয়ে মাল বওয়ানোও যায়, বাচ খেলানোও চলে। বড়ো পয়ারের দেহ-সংস্থান এর উল্টো—তার প্রথমভাগে আট শেষভাগে দশ—তার গৌরবটা ক্রমেই প্রশস্ত

হয়ে উঠেছে। ছোটো পয়ারের ছিব্‌লেমির একটা পরিচয় দেওয়া যাক্—

সব তা'র বোলচাল, সাজ ফিট্‌ফাট্,
তকরার হোলে আর নাই মিট্‌মাট্।
চশমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,
কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এর ভাগগুলোকে কাটা কাটা ছোটো ছোটো ক'রে হ্রস্বস্বরে হসন্তবর্ণে ঘন ঘন ঝোঁক দিয়ে এর চটুলতা বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। এখানে এটা পাৎলা কিরিচের মতো। একেই আবার যুগ্মধ্বনির যোগে মজ্‌বুৎ ক'রে খাঁড়া ক'রে তোলা যায়।

বাক্য তার অনর্গল মল্ল সজ্জাশালা।
তর্ক যুদ্ধে উগ্র তেজ, শেষ যুক্তি গালি।
ভ্রুকুটী প্রচ্ছন্ন চক্ষু কটাক্ষিণী চায়
কুত্রাপিও মহত্ত্বের চিহ্ন নাহি পায়॥

যেখানে-সেখানে নানাপ্রকার অসমান ভার নিয়েও পয়ারের পদস্খলন হয় না এই তত্ত্বটির মধ্যে অসামান্যতা আছে। অন্য কোনো ভাষার কোনো ছন্দে এ রকম স্বচ্ছন্দতা এতটা পরিমাণে আছে ব'লে আমি তো জানিনে।

এর কৌশলটা কোন্‌খানে যখন ভেবে দেখা যায় তখন দেখি পয়ারে প্রত্যেক পদের মাঝখানে ও শেষে যে দুটো হাঁফ ছাড়বার যতি আছে সেইখানেই তার ভার সামঞ্জস্য হয়ে থাকে।

> নিঃস্বতা-সঙ্কোচে দিন। অবসন্ন তাপে
> নিভৃতে নিঃশব্দ সন্ধ্যা। লয় তারে কোলে।

গণনা ক'রে দেখলে ধরা পড়ে এই পয়ারের দুই লাইনে ধ্বনিভারের সাম্য নেই। তবু যে টলমল করতে করতে ছন্দটা কাৎ হয়ে পড়ে না, তার কারণ, ডাইনে বাঁয়ে যতির লাগর ঠেকা দিয়ে দিয়ে তাকে চালিয়ে নেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু যেমন তার ভারী দেহটাকে দুইজোড়া পায়ের দ্বারা দুই দিকে ঠেকাতে ঠেকাতে চলে সেই রকম। পয়ারের প্রকৃতরূপ চোদ্দোটা অক্ষরে নয়, সেটা প্রথম অংশের আট অক্ষর ও দ্বিতীয় অংশের ছয় অক্ষরের পরবর্তী দুই যতিতে। অজগর সমস্ত দেহটা নিয়ে চলে। তার দেহে মুণ্ড এবং ধড়ের মধ্যে ভাগ নেই। ঘোড়ার দেহে সেই ভাগ আছে। তার মুণ্ডটার পরে যেখানে গলা সেখানে একটা যতি, ধড়ের শেষভাগে যেখানে ক্ষীণ-কটি সেখানেও আর একটা। এই বিভক্ত ভারের

দেহকে সামলিয়ে নিয়ে সে চার পা ফেলে চলে। পয়ারের সেই রকম বিশেষভাবে বিভক্ত দেহ এবং চার পা ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলা। চতুষ্পদ জন্তুর দুই পায়ের সমান বিন্যাস। যদি এমন হোত যে, কোনো জানোয়ারের পা দুটো বাঁয়ের চেয়ে ডাইনে এক ফুট বেশি লম্বা তাহোলে তার চলনে স্থিতির চেয়ে অস্থিতিই বেশি হোত—সুতরাং তার পিঠে সওয়ার চাপালে কোনো পক্ষেই আরাম থাক্‌ত না। ছন্দে তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

তরণী বেয়ে শেষে। এসেছি ভাঙা ঘাটে,
স্থলে না মেলে ঠাঁই। জলে না দিন কাটে।

এ ছড়ায় প্রত্যেক লাইনে চোদ্দো অক্ষর—এবং মাঝে আর শেষে দুই যতিও আছে। তবু ওকে পয়ার বল্‌বার জো নেই। ওর পা ফেলার ভাগ অসমান।

তরণী | বেয়ে শেষে ॥ এসেছি | ভাঙা ঘাটে ॥

এক পায়ে তিন মাত্রা আর এক পায়ে চার। সাত মাত্রার পরে একটা ক'রে যতি আছে, বেজোড় অঙ্কের অসাম্য ঐ যতিতে পূরো বিরাম পায় না। সেইজন্যে সমস্ত পদটার মধ্যে নিয়তই একটা অস্থিরতা থাকে যে-পর্য্যন্ত না পদের শেষে এসে একটা সম্পূর্ণ স্থিতি ঘটে।

এই অস্থিরতাই এরকম ছন্দের স্বভাব অর্থাৎ পয়ারের ঠিক বিপরীত। এই অস্থিরতার সৌন্দর্য্যকে ব্যবহার করবার জন্যেই এই রকম ছন্দের রচনা। এর পিঠের উপর যেমন-তেমন ক'রে যুগ্মধ্বনির সওয়ার চাপালে অস্বস্তি ঘটে। যদি লেখা যায়—সায়াহ্ন অন্ধকারে এসেছি ভগ্ন ঘাটে—তাহোলে ছন্দটার কোমর ভেঙে যাবে। তবুও যদি যুগ্মবর্ণ দেওয়াই মত হয় তাহোলে তার জন্যে বিশেষভাবে জায়গা ক'রে দিতে হবে। পয়ারের মতো উদারভাবে যেমন খুসি ভার চাপিয়ে দিলেই হোলো না।

অন্ধরাতে যবে | বন্ধ হোলো দ্বার,
ঝঞ্ঝাবাতে ওঠে | উচ্চ হাহাকার।

মনে রাখা দরকার এই শ্লোক অবিকৃত রেখেও এর ভাগের যদি পরিবর্ত্তন ক'রে পড়া যায়, দুই ভাগের বদলে প্রত্যেক লাইনে যদি তিন ভাগ বসানো যায় তাহোলে এটা আরেক ছন্দ হয়ে যাবে। এ'কে নিম্নলিখিত রকম ভাগ ক'রে পড়া যাক্,—

অন্ধরাতে | যবে বন্ধ | হোলো দ্বার ॥
ঝঞ্ঝা বাতে | ওঠে উচ্চ | হাহাকার

পশুপক্ষীদের চলন সমান মাত্রার দুই বা চার পায়ের উপর। এই পা-কে কেবল যে চল্‌তে হয় তা নয় দেহভার বইতে হয়। পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বিরাম আছে ব'লে বোঝা সামলিয়ে চলা সম্ভব। আজ পর্য্যন্ত জীবলোকে জুড়িওয়ালা পায়ের পরিবর্ত্তে চাকার উদ্ভব কোথাও হোলো না। কেননা চাকা না থেমে গড়িয়ে চলে—চলার সঙ্গে থামার সামঞ্জস্য তার মধ্যে নেই। দুই মূলক সমমাত্রায় দুই পায়ের চাল, তিন মূলক অসম মাত্রায় চাকার চাল। দুই পা-ওয়ালা জীব উঁচু নিচু পথের বাধা ডিঙিয়ে চলে যায়।—পয়ারের সেই শক্তি। চাকা বাধায় ঠেকলে ধাক্কা খায়, ত্রৈমাত্রিক ছন্দের সেই দশা। তার পথে যুগ্মস্বর যাতে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টা করতে হবে।

অনার বাতাস এল সকালে,
বনেরে বৃথাই শুধু বকালে।
দিন শেষে দেখি চেয়ে
ঝরা ফুলে মাটি ছেয়ে
লতারে কাঙাল ক'রে ঠকালে।

এ ছন্দ পয়ার জাতীয়—টেনিস্ খেলোয়াড়ের

আধা পায়জামার মতো বহরটা নিচের দিকে ছাঁটা। এ ছন্দে তাই যুগ্মস্বর যেমন খুসি চলে।

নবারুণ চন্দনের তিলকে
দিক-ললাট এঁকে আজি দিল কে।
বরণের পাত্র হাতে
উষা এল সুপ্রভাতে,
জয়শঙ্খ বেজে ওঠে ত্রিলোকে।

কিন্তু

শরতে শিশির বাতাস লেগে
জল ভরে আসে উদাসী মেঘে।
বরষণ তবু হয় না কেন,
ব্যথা নিয়ে চেয়ে রয়েছে যেন।

এখানে তিনমাত্রার ছন্দ গড়িয়ে চলেছে—চাকার চাল, পা ফেলার চাল নয়, তাই যুগ্মবর্ণের স্বেচ্ছাচারিতা এর সইবে না।

চাষের সময়ে যদিও করিনি হেলা
ভুলিয়া ছিলাম ফসল কাটার বেলা।

পয়ারের মতোই চোদ্দোটা অক্ষরে পদ—কিন্তু জাত আলাদা। তিনমাত্রার চাকায় চলেছে। পদাতিকের সঙ্গে চক্রীর মেলে না।

শ্যামল ঘন | বকুল বন | ছায়ে ছায়ে
যেন কী সুর | বাজে মধুর | পায়ে পায়ে।

এখানেও চোদ্দো অক্ষর—কিন্তু এর চালে পয়ারের মতো সম মাত্রার পদচারণের শান্তি নেই ব'লে বিষম মাত্রার ভাগগুলি যতির মধ্যেও গতির ঝোঁক রেখে দেয়। খোঁড়া মানুষের চলার মতো—যতক্ষণ না লক্ষ্য স্থানে গিয়ে ব'সে পড়ে, থেমেও ভালো ক'রে থামতে পারে না।

বাংলা চল্‌তি ভাষায় মূল সংস্কৃত শব্দের অনেকগুলি স্বরবর্ণই কোনোটা আধখানা কোনোটা পুরোপুরি ক্ষ'য়ে যাওয়াতে ব্যঞ্জনগুলো তাল পাকিয়ে অত্যন্ত পরস্পরের গায়ে-পড়া হয়ে গেছে। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে, —সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না, বসতি এবং বস্‌তি, শব্দগুলো তুলনা ক'রে দেখলেই বোঝা যাবে। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য, আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য এইটেই হোলো ছুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসঙ্গীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসঙ্গীতে প্রভূত প্রভেদ। এই দুইয়েরই বিশেষ

মূল্য আছে—বাঙালি কবি তাঁদের কাব্যে যথাস্থানে দুটোরই সুযোগ নিতে চান। তাঁরা ধ্বনিরসিক ব'লেই কোনোটাকেই বাদ দিতে ইচ্ছা করেন না।'

প্রাকৃত বাংলার ধ্বনির বিশেষত্ববশত দেখ্তে পাই তার ছন্দ তিনমাত্রার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। অর্থাৎ তার তালটা স্বভাবতই একতালা জাতীয়, কাওয়ালি জাতীয় নয়। সংস্কৃত ভাষায় এই "তাল" শব্দটা দুই সিলেব্লের—বাংলায় ল আপন অন্তিম অকার খসিয়ে ফেলেছে, তার জায়গা টি বা টা যোগ ক'রে শব্দটাকে পুষ্ট করবার দিকে তার ঝোঁক। টি টায়ের ব্যবধান যদি না থাকে তবে ঐ নিস্বর ধ্বনিটি প্রতিবেশী যে-কোনো ব্যঞ্জন বা স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ণতা পেতে চায়।

—রূপ সাগরের তলে ডুব দিনু আমি—

এটা সংস্কৃত বাংলার ছাঁদে লেখা। এখানে শব্দগুলো পরস্পর গা-ঘেঁষা নয়। বাংলা প্রাকৃতের অনিবার্য্য নিয়মে এই পদের যে শব্দগুলি হসন্ত, তারা আপনারই স্বরধ্বনিকে প্রসারিত ক'রে ফাঁক ভর্ত্তি ক'রে নিয়েছে। "রূপ" এবং "ডুব" আপন উকারধ্বনিকে টেনে বাড়িয়ে দিলে। "সাগরের" শব্দ আপন একারকে পরবর্ত্তী হসন্ত

র-য়ের পঙ্গুতা চাপা দিতে লাগিয়েছে। এই উপায়ে ঐ পদটার প্রত্যেক শব্দ নিজের মধ্যেই নিজের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এ ছন্দে ডিমক্রেসির প্রভাব নেই। এই রকমের ছন্দে দুইমাত্রার ধ্বনি আপন পদক্ষেপের প্রত্যেক পর্য্যায়ে যে অবকাশ পায় তা নিয়ে তার গৌরব। বস্তুত এই অবকাশের সুযোগ গ্রহণ ক'রে তার ধ্বনি-সমারোহ বাড়িয়ে তুললে এ ছন্দের সার্থকতা। যথা—

চৈতন্য নিমগ্ন হোলো রূপসিন্ধুতলে।

প্রাকৃত বাংলা দেখা যাক্ঃ—

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা ক'রে"
—এখানে "রূপ" আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে "সাগরে"র সা-টাকে টেনে আপন ক'রে নিয়েছে, মাঝে ব্যবধান থাক্‌তে দেয়নি। "রূপ-সা" তাই আপনিই তিনমাত্রা হয়ে গেল। "সাগরের" বাকি টুক্‌রো রইল "গরে"। সে আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে "রে"-টাকে দিলে লম্বা ক'রে, তিনমাত্রা পূরল। "ডুব্" আপনার হসন্তর টানে "দিয়েছি"র দি-টাকে করলে আত্মসাৎ। এমনি ক'রে আগাগোড়া জমে উঠল। হসন্ত-প্রধান ভাষা সহজেই তিনমাত্রার দানা পাকায়, এটা দেখেছি। এমন কি,

যেখানে হসন্তের ভিড় নেই সেখানেও তার ঐ একই চাল। এটা যেন তার অভ্যস্ত হয়ে মজ্জাগত হয়ে গেছে। যেমন ঃ—

আছে- | গেলে- | ছিলেম | ভালো- |
আমার | চেতন | কর্লি | কেনে- |

প্রাকৃত বাংলার এই তিনমাত্রার ভঙ্গী চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা সাধুভাষাতেও গ্রহণ করেছেন। যেমন ঃ—

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়।

কিন্তু প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে একটু ভাববার বিষয় আছে।

মন্ত্রবেগে বারুদ ছুট্‌ল উর্দ্ধশ্বাসে,
ঘূর্ণীবেগে উড়্‌ল ধুলো রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

কিম্বা—

ছুট্‌ল কেন মহেন্দ্রের আনন্দের ঘোর,
টুট্‌ল কেন উর্বশীর মঞ্জীরের ডোর।
বৈকালে বৈশাখী এল আকাশ লুণ্ঠনে,
শুক্ররাতি ঢাকল মুখ মেঘাবগুণ্ঠনে॥

এদের সম্বন্ধে কী বলা যাবে?

প্রধানত ক্রিয়াপদেরই বিশেষ রূপটাতে প্রাকৃত বাংলার চেহারা ধরা পড়ে। উপরের ছড়াগুলিতে উড়্‌ল ছুট্‌ল টুট্‌ল ঢাক্‌ল প্রভৃতি প্রয়োগ নিয়ে তর্কটা ছন্দের তর্ক নয়, ভাষারীতির। এই রকম ক্রিয়াপদ যদি ব্যবহার করি তবে ধ'রে নিতে হবে ঐ ছড়াগুলি প্রাকৃত বাংলাতেই লেখা হচ্চে। আমি যে প্রবন্ধ লিখ্‌ছি এও প্রাকৃত বাংলার ঠাটে। যদি আমাকে কারো সঙ্গে মুখে মুখে আলোচনা করতে হোত তা হোলে এই লেখার সঙ্গে আমার মুখের কথার কোনো তফাৎ থাকত না। মাঝে মাঝে অভ্যাস দোষে হয়তো ইংরেজি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত কিন্তু কখনোই "করিয়াছিল" "গিয়াছে" ধরণের ক্রিয়াপদ ভুলেও ব্যবহার করতে পারতুম না। আবার প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ সংস্কৃত বাংলায় ব্যবহার করাও চলে না। প্রবোধচন্দ্র "বিচিত্রা"য় লিখেছেন যে, বাঙাল কবিরা সাহস ক'রে কবিতায় করিব চলিব প্রভৃতি প্রয়োগ না ক'রে কেন কর্‌ব চল্‌ব প্রয়োগ না করেন? যদি প্রশ্নটার অর্থ এই হয় যে, অযথা স্থানে কেন করিনে তবে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। যদি বলেন যথাস্থানেও কেন করিনে তবে তার উত্তরে বলব, যথাস্থানে ক'রে থাকি।

যে তর্ক নিয়ে লেখা সুরু করেছিলেম সেটাতে ফিরে আসা যাক্‌। বাংলায় হসন্তমধ্য শব্দগুলোয় কয় মাত্রা গণনা করা হবে তাই নিয়ে সংশয় উঠেছে।

যেগুলি ক্রিয়াপদ নয় সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এ প্রবন্ধের গোড়াতেই আলোচনা করেছি। বলেছি নিয়মের বিকল্প চলে, কেননা বাঙালির কান সাধারণ ব্যবহারে সেই বিকল্প মঞ্জুর করেছে। এ ক্ষেত্রে হিসাবে একটা মাত্রার কমি-বেশি নিয়ে তর্ক ওঠে না।—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকরুণ।

অন্তত চিম্‌নিকে তুই মাত্রা করায় কবির দোষ হয়নি। আবার

চিমনি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর নাই কোনো দোষ।

এ রকম বিপর্য্যয়ও চলে। একই ছড়ায় চিম্‌নিকে একমাত্রা প্রেস মার্কা দেওয়া হয়েছে অথচ ঠাক্‌রুণকে খর্ব্ব ক'রে তিনমাত্রায় নামানো গেল। অপরাধ ঘটেছে ব'লে মনে করিনি।

কুস্তির আখড়ায় ভিস্তিকে ধ'রে
জল ছিটাইয়া দাও ধুলা যাক ম'রে।

অপর পক্ষে

> রাস্তা দিয়ে কুস্তিগির চলে ঘেঁষাঘেঁষি,
> একটা নয় দুটো নয় একশোর বেশি।

প্রয়োজন মতো এটাও চলে ওটাও চলে।

নিখুঁতির মাপে বিচার করতে গেলে বিশুদ্ধ ওজনের পয়ার হচ্চে—

> —পালোয়ানে পালোয়ানে চলে ঘেঁষাঘেঁষি—

তাতে প্রত্যেক অক্ষর নিখুঁৎ একমাত্রা, সবশুদ্ধ চৌদ্দটা। রাস্তা কুস্তি প্রভৃতি শব্দে ওজন বেড়ে যায় তবুও বহু-সহিষ্ণু পয়ারকে কাবু করতে পারে না।

প্রাকৃত বাংলার ক্রিয়াপদ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ক্রিয়াপদেই তার আপন চেহারা। ঐটুকু ছাড়া তার আর কোনো উপসর্গ নেই বল্লেই চলে। বাংলা সংস্কৃত ভাষার মতো সে শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়। ভোজে ব'সে গেছে ব্রাহ্মণ, তাকে পরিবেষণকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলে নিরামিষ না আমিষ, সে বল্লে, দ্বৌকর্ত্তব্যো। তেমনি শব্দ বাছাই নিয়ে যদি প্রাকৃত বাংলাকে প্রশ্ন করা যায়, কী চাই, প্রাকৃত শব্দ না সংস্কৃত শব্দ? সে বলবে দ্বৌকর্ত্তব্যো। তার জাতবিচার নেই বললেই হয়। পছন্দ হবামাত্র ইংরেজি পারসী সব শব্দই সে আত্মসাৎ করে।

আবার অমরকোষবিহারী বড়ো বড়ো বহরওয়ালা সংস্কৃত শব্দকে ওদেরি ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। সংস্কৃত ভাষার প্রতি সম্ভ্রমবশত তার মুখে বাধ্‌বে না—

রূপ যৌবন উপঢৌকন
দেবেন কন্যা তাহারে
বাহু পরেছেন চামরগুচ্ছের
কটিবসন বাহারে।

নন্-কো-অপারেশনের দিনেও ইংরেজ শব্দ চালিয়ে দিতে পিকেটিঙের ভয় নেই। যথা—

আর্টিফিসাল নিয়ে থাকে, নাহি চড়ে গাড়ি,
প্র্যাকটিক্যাল লোকে বলে, এ যে বাড়াবাড়ি।
শিবনেত্র হোলো বাবা, এইবার মোলো,
অক্সিজেন নাকে দিয়ে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

কিন্তু সংস্কৃত বাংলায় বাচবিচার খুব কড়া। আধুনিকদের হাতে প'ড়ে ম্লেচ্ছপনা কিছু কিছু সয়ে গেছে, কিন্তু সেটুকু বড়ো জোর বাইরের রোয়াকে—ভিতরমহলে রীতিরক্ষা সম্বন্ধে কষাকষি।

কর্ণে দিলা ঝুম্‌কাফুল, নাসিকায় নথ,
অঙ্গ-সজ্জা সমাধানে ভূমি মেত্তমং। '

এটাকে প্রহসন ব'লে পাঠক হয়তো মাপ করতে পারেন

কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় এই রকম ভিন্ন পর্য্যায়ের শব্দগুলো যখন কাছাকাছি বসানো যায় তাদের আওয়াজের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বেমিল হয় না। আমার এই গদ্য প্রবন্ধ প'ড়ে দেখলে পাঠকেরা সেটা লক্ষ্য করতে পারবেন। কিন্তু এটাও দেখে থাক্‌বেন এটার মধ্যে করিব করিয়াছে করিয়াছিল প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ কলমের কোনো ভুলে ঢুকে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেইজন্যে আমরা বাংলায় সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে দুই ভিন্ন নিয়মেই চ'লি—তার অন্যথা করা অসম্ভব। তাই বাংলা কাব্যে এই দুই ভাষার ধারায় ছন্দের রীতি যদি দুই ভিন্ন পথ নিয়ে থাকে তবে সেই আপত্তিতে শুদ্ধির গোময় লেপনে সমস্ত একাকার করবার পক্ষপাতী আমি নই। আমি বলি দ্বৈকর্ত্তব্যৌ। কারণ ছন্দের এই দ্বিবিধরসেই আমার রসনার লোভ।

১৩৩৮
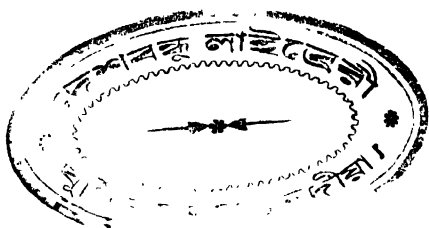
সঙ্গীতের মুক্তি

[মুখ্যত এই লেখাটি সঙ্গীত-সম্বন্ধীয়। তালের আলোচনা কালে আপনা থেকে এর শেষদিকে ছন্দের কথা এসে পড়েছে। সে কারণেই একে "ছন্দ" গ্রন্থে গ্রহণ করা গেল।]

সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য সঙ্গীত-সঙ্ঘ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। ফরমাস এই যে, দিশি বিলিতি কোনোটাকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। বিষয়টা গুরুতর, এবং আলোচনা করবার একটি মাত্র যোগ্যতা আমার আছে; সেটা এই যে, দিশি এবং বিলিতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি নে।

তা ব'লে জানি নে বলতে এতটা দূর বোঝায় না যে, সঙ্গীতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নাই। সম্পর্কটা কী রকম একটু খোলসা ক'রে বলা চাই।

পৃথিবীতে দুই রকমের জানা আছে। এক ব্যব-সায়ীর জানা, আর এক অব্যবসায়ীর জানা। ব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র। আর

অব্যবসায়ী জানে, যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাবভাব, চালচলন।

এই নাড়ি-নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে। তাই সরলহৃদয় আনাড়িদের মনে সর্ব্বদাই একটা ভয় থাকে, ঐ নাড়ি-নক্ষত্র পদার্থটা না জানি কী! আর, ব্যবসায়ী লোকেরা ঐ নাড়ি-নক্ষত্রের দোহাই দিয়ে অব্যবসায়ী লোকের মুখ চাপা দিয়ে রাখেন।

অথচ জগতে ওস্তাদ কয়েকজন মাত্র, আর অধিকাংশই আনাড়ি। বর্ত্তমান যুগের প্রধান সর্দ্দার হচ্চে ডিমক্রেসি, সাধুভাষায় যাকে বলে "অধিকাংশ।" অতএব, এ যুগে আনাড়িরও কথা বলবার অধিকার আছে। এমন কি, তার অধিকারই বেশি। যে বলে আমি জানি সেই কেবল কথা কয়ে যাবে, আর যে জানে আমি জানি নে সেই চুপ করে থাকবে এ কালের এমন ধর্ম্ম নয়। অতএব আজ আমি গান সম্বন্ধে যা বলব তা সেই আনাড়িদের প্রতিনিধিরূপে।

কিন্তু মনে থাকে যেন আনাড়িদের একজন মাত্র প্রতিনিধিতে কুলোয় না। সব সেয়ানের এক মত, কেননা তাদের বাঁধা রাস্তা; যারা সেয়ানা নয় তাদের

অনেক মত, কেননা তাদের রাস্তাই নেই। তাই বহু সেয়ানের এক প্রতিনিধি চলে কিন্তু অসেয়ানাদের মধ্যে যতগুলিই মানুষ ততগুলিই প্রতিনিধি। অতএব হিসাব নিকাশের সময় হয়তো দেখবেন আমার মতের মিল একব্যক্তির সঙ্গেই আছে, এবং সে ব্যক্তি আমার মধ্যেই বিরাজমান।

আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি। কেননা, পথ একটা বই নয় কিন্তু অপথের সীমা কোথায়। সে দিক দিয়ে যে চলে সে-ই বেশি দেখে বেশি ঠেকে। আমি পথ জানিনে ব'লেই হোক্ কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের ব'লেই হোক্ এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়েই চলেছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যা মিলেছে তা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না। এটা নিশ্চয়ই অপরাধের বিষয় কিন্তু সেই জন্যই হয়তো মনোরম হোতে পারে।

কাব্যকলা বা চিত্রকলা দুটি ব্যক্তিকে নিয়ে। যে-মানুষ রচনা করে আর যে-মানুষ ভোগ করে। গীতিকলায় আরো একজন প্রবেশ করেছে। রচয়িতা এবং শ্রোতার ফাঁকটার মধ্যে আছে ওস্তাদ।

মধ্যস্থ পদার্থটা বিন্ধ্য পর্ব্বতের মতো বাধাও হোতে পারে আবার সুয়েজ ক্যানালের মতো সুযোগও হোতে পারে। তবু যাই হোক্, উপসর্গ বাড়লে বিপদও বাড়ে। রসের স্রষ্টা এবং রসের ভোক্তা এই দুয়ের উপযুক্তমতো সমাবেশ, সংসারে এইই তো যথেষ্ট দুর্লভ—তার উপরে আবার রসের বাহনটি—ত্রৈগুণ্যের এমন পরিপূর্ণ সম্মিলন বড়ো কঠিন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, দুয়ের যোগে সঙ্গ, তিনের যোগে গোলযোগ।

ইন্দ্রের চেয়ে ইন্দ্রের ঐরাবতের বিপুলতা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বড়ো। গীতিকলায় তেমনি ওস্তাদ অনেকখানি জায়গা জুড়েছেন। দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে যেমন ঢের বেশি খাতির করতে হয় তেমনি আসরে ওস্তাদের খাতির স্বয়ং সঙ্গীতকেও যেন ছাড়িয়ে যায়। কৃষ্ণ বড়ো কি রাধা বড়ো এ তর্ক শুনেছি, কিন্তু মথুরার রাজসভার দারোয়ানজি বড়ো কি না এই তর্কটা বাড়্‌ল।

যে লোক মাঝারি সে তার মাঝখানের নির্দ্দিষ্ট জায়গাটিতে সন্তুষ্ট থাকে না, সে প্রমাণ করতে চায় যে, সে-ই যেন উপরওয়ালা। উত্তমের বিনয় স্বাভাবিক, অধমের বিনয় দায়ে প'ড়ে, কিন্তু জগতে সব চেয়ে দুঃসহ

ঐ মধ্যম। রাজা মানুষটি ভালোই, আর প্রজা তো মাটির মানুষ, কিন্তু আম্‌লা! তার কথা চেপে যাওয়াই নিরাপদ! নিজের "রাজকর্ম্মচারী" নামটার প্রথম অংশটাই তার মনে থাকে, দ্বিতীয় অংশটা কিছুতেই সে মুখস্থ ক'রে উঠতে পারে না। এই কারণেই যেখানে প্রজার হাতে কোনো ক্ষমতাই নেই সেখানে আমলাতন্ত্র অর্থাৎ ব্যুরোক্রেসি উঁচুদরের জিনিস হোতে পারে না। আমাদের সঙ্গীতে এই ব্যুরোক্রেসির আধিপত্য ঘটল।

এইখানে য়ুরোপের সঙ্গীত-পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীত-পলিটিক্সের তফাৎ। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশি বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকতে হয়। গানের কর্ত্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা ক'রে দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পুর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হয়ে থাকতে হবে তাও নয়,আবার খুব যে দাপাদাপি করবেন সে রাস্তাও বন্ধ।

য়ুরোপের প্রত্যেক গানে আছে বিশেষ ব্যক্তিত্ব, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্য্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্য্যাদাই প্রকাশ করে।

য়ুরোপীয় ওস্তাদকে সাবধানে গানের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। আমাদের দেশের গানে ব্যক্তিত্ব আছে, কেবল সে কোন্ জাতি তাই সন্তোষজনকরূপে প্রমাণ করবার জন্যে। য়ুরোপে গানসম্বন্ধে যে-কর্ত্তৃত্ব গান-রচয়িতার, আমাদের দেশে তাই দুজনে বখ্‌রা ক'রে নিয়েছে, গানওয়ালা এবং গাহনে-ওয়ালা। যেখানে কর্ত্তৃত্বের এমন জুড়ি হাঁকানো হয় সেখানে রাস্তাটা চওড়া চাই। গানের সেই চওড়া রাস্তার নাম রাগরাগিণী। সেটা গানকর্ত্তার প্রাইভেট রাস্তা নয়, সেখানে ট্রেস্‌পাসের আইন খাটে না।

এক হিসাবে এ বিধিটা ভালোই। যে-মানুষ গান বাঁধবে আর যে-মানুষ গান গাইবে দুজনেই যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হয় তবে তো রসের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। যে-গান গাওয়া হচ্চে সেটা যে কেবল আবৃত্তি নয় সে যে তখন-তখনি জীবন উৎস হতে তাজা উঠছে এটা অনুভব করলে শ্রোতার আনন্দ অক্লান্ত অম্লান হয়ে থাকে। কিন্তু মুস্কিল এই যে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা জগতে বিরল। যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণত এরা দুই জাতের মানুষ। দৈবাৎ এদের জোড় মেলে কিন্তু সর্ব্বদা মেলে

না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্ত্তার ভাগে, আর ওস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু ওস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়তেই থাকে। কেননা, ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি, এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সব চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা। এই জন্যে ভারতের বৈঠকী সঙ্গীত কালক্রমে সুরসভা ছেড়ে অসুরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে। সেখানে তান-মান-লয়ের তাণ্ডবটাই প্রবল হয়ে ওঠে, আসল গানটা ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে।

রসবোধের নাড়ি যখন ক্ষীণ হয়ে আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়, সাহিত্যের ইতিহাসেও এর প্রমাণ আছে। এদেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্ব্বদা মিল্‌ত, গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পেত লড়াইয়ের নয়। তখন এমন সকল শ্রোতাও নিশ্চয় ছিল যাঁরা সঙ্গীত-ভাটপাড়ার বিধান যাচিয়ে গানের বিচার করতেন না। কেননা, শোনবারও প্রতিভা থাকা চাই কেবল শোনাবার নয়।

বিশ্বের একটা হৃদয়ের আভা নিয়ত প্রকাশ পাচ্চে। ভোরবেলাকার আকাশে হাওয়ায় এমন কিছু-একটা আছে, যেটা কেবলমাত্র বস্তু নয়, ঘটনা নয়, যেটা কেবল রস। এই রসের ক্ষেত্রেই আমাদের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের রাগ অনুরাগের মিল। এই মিলের তত্ত্বটি অনির্ব্বচনীয়। যা নির্ব্বচনের যোগ্য তা পৃথক, তা আপনাতে আপনি সুনির্দ্দিষ্ট। যেখানে পদ্মফুল নির্ব্বচনীয় সেখানে তার আকার আয়তন ও বস্তুপরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধভাবে তার আপনারই। কিন্তু যেখানে পদ্মটি অনির্ব্বচনীয় সেখানে সে যেন আপনার সমস্তটার চেয়েও আপনি অনেক বেশি। এই বেশিটুকুই তার সঙ্গীত।

পদ্মের যেখানে এই বেশি সেখানে তার সঙ্গে আমার বেশিরও একটা গভীর মিল। তাই তো গাইতে পারি—

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল !
দুলিলরে দুলিল
মানস-সরসে রসপুলকে ;
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল !

গগন মগন হোলো গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে ;
গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;
নিখিল ভুবন মন ভুলিল
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !

হৃদয়ের আনন্দে আর পদ্মে অভেদ হোলো—ভাষার একেবারে উলট পালট হয়ে গেল। যার রূপ নেই সে রূপ ধরল, যার রূপ আছে সে অরূপ হোলো। এমন সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে কোথায় ?—সৃষ্টি যেখানে অনির্ব্বচনীয়তায় আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়।

আমাদের রাগরাগিণীতে সেই অনির্ব্বচনীয় বিশ্ব-রসটিকে নানা বড়ো বড়ো আধারে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। যখন কল হয় নি তখন কলকাতায় গঙ্গার জল যেমন ক'রে জালায় ধরা হোত। যজ্ঞকর্ত্তা আপন ইচ্ছা ও শক্তি অনুসারে নানা গড়নের ও নানা ধাতুর পাত্রে

সেই রস পরিবেষণ করতে পারেন কিন্তু একই সাধারণ জলাশয় হতে সেটা বয়ে আনা।

অর্থাৎ আমাদের মতে রাগরাগিণী বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে নিত্য আছে। সেইজন্য আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, সে যেন সমস্ত জগতের। ভৈরোঁ যেন ভোর বেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ-বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চির বিরহ বেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তি-নিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষ ভাবে এই বিশ্বরসটিকেই রসিয়ে তোলবার ভার নিয়েছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেষ ক'রে প্রকাশ করা তার অভিপ্রায় নয়। তাই যে-সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাতে আমোদ আহ্লাদের উল্লাস নেই তাই আমাদের বিবাহ উৎসবের রাগিণী। নব নারীর মিলনের মধ্যে যে চিরকালীন বিশ্বতত্ত্ব আছে সেইটিকে সে স্মরণ করাতে থাকে, জীবজন্মের আদিতে যে দ্বৈতের

সাধনা তারি বিরাট বেদনাটিকে ব্যক্তিবিশেষের বিবাহ-ঘটনার উপরে সে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত সুরে গাওয়া হয়, তাতে বৈচিত্র্য নেই, তা রাগিণী নয়, তা সুর মাত্র। আর কিছু নয়, ওটুকুতে কেবল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতা, দীনতা এবং বিচ্ছিন্নতাব উপরের দিকে একটু ইসারা ক'রে দেয় মাত্র। মহাকাব্যের ভাষাটা যেখানে একটা কাহিনী ব'লে চলে, সুর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে কেবল বলতে থাকে, অহো, অহো, অহো! ক্ষিতি অপে মিশাল ক'রে যে-মূর্ত্তি গড়া তার সঙ্গে তেজ মরুৎ ব্যোমের সংযোগ আছে এই খবরটা মনে করিয়ে রাখে।

মহাকাব্যের বড়ো কথাটা যেখানে স্বতই বড়ো, কাব্যের খাতিরে সুর সেখানে আপনাকে ইঙ্গিত মাত্রে ছোটো ক'রে রেখেছে কিন্তু যেখানে আবার সঙ্গীতই মুখ্য সেখানে তার সঙ্গের কথাটি কেবলি বলতে থাকে আমি কেউ না, আমি কিছুই না; আমার মহিমা সুরে। এই জন্য হিন্দুস্থানী গানেব কথাটা অধিকাংশ স্থলেই যা-খুসি-তাই। এই যে পূরবীর গান—

"লইরে শ্যাম এঁদোরিয়া
ক্যয়সে বঁক মেবে শিরো পর গাগরিয়া।"

এর মানে, শ্যাম আমার জলের কলসী রাখবার "বিড়ে"টা চুরি করেছে। এই তুচ্ছ কথাটাকে এত বড়ো সুগভীর বেদনার সুরে বাঁধবামাত্র মন বলে, এই যে কলসী এই যে বিড়ে, এ তো সামান্য কলসী সামান্য বিড়ে নয়, এ এমন একটা-কিছু চুরি, যার দাম বলবার মতো ভাষা জগতে নেই, যার হিসাবের অসীম অঙ্কটা কেবল ঐ পূরবীর তানের মধ্যেই পৌঁছে।

কোনো একটা বিশেষ উদ্দীপনা—যেমন যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে রণোৎসাহে উত্তেজিত করা—আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখা যায় না। তার বেলায় তুরী ভেরী দামামা শঙ্খ প্রভৃতির সহযোগে একটা তুমুল কোলাহলের ব্যবস্থা। কেননা আমাদের সঙ্গীত জিনিষটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সঙ্কীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট ক'রে দেবার জন্যেই। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন জিনিষ নয়। কেননা বিকৃতিকে নিয়েই বিদ্রূপ। প্রকৃতির ত্রুটিই এই বিকৃতি, সুতরাং তা বৃহতের বিরুদ্ধ। শান্ত হাস্য বিশ্বব্যাপী কিন্তু অট্টহাস্য নয়। সমগ্রের সঙ্গে অসামঞ্জস্যই পরিহাসের ভিত্তি। এইজন্যই

আমাদের আধুনিক উত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান স্বভাবতই বিলিতি ছাঁদের হয়ে পড়ে।

বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাৎ সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি নিয়ে যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। এরি যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগরাগিণী যদিবা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে যে কন্সর্টের প্রচলন ছিল তার গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা-কাটা নৃত্য করতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা নিয়ে সঙ্গীতের গভীরতা। এই সব কাটা সুরগুলিকে নিয়ে নানা প্রকারে খেলানো যায়,—উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো, নানা ভাবে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগরাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্য্যে নির্ব্বিকারভাবে বিরাজ করছে সেখানে এরা লজ্জিত।

স্বর্গলোকের একটা মস্ত সুবিধা কিম্বা অসুবিধা

আছে, সেখানে সমস্তই সম্পূর্ণ। এইজন্য দেবতারা কেবলি অমৃত পান করছেন কিন্তু তাঁরা বেকার। মাঝে মাঝে দৈত্যেরা উৎপাত না করলে তাঁদের অমরত্ব তাঁদের পক্ষে বোঝা হয়ে উঠত। তাঁদের স্বর্গোদ্যানে তাঁরা ফুল তুলে' মালা গাঁথতে পারেন কিন্তু সেখানে ফুল গাছের একটা চান্‌কাও তাঁরা বদল ক'রে সাজাতে পারেন না, কেননা সমস্ত সম্পূর্ণ। মর্ত্ত্যলোকে যেখানে অপূর্ণতা সেইখানেই নূতনের সৃষ্টি, বিশেষের সৃষ্টি, বিচিত্রের সৃষ্টি। আমাদের রাগরাগিণী সেই স্বর্গোদ্যান। সে চিরসম্পূর্ণ। এই জন্যই আমাদের রাগরাগিণীর রসটি সাধারণ বিশ্বরস। মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা, বসন্ত বাহার বিশ্বের বসন্ত। মর্ত্ত্যলোকের দুঃখ সুখের অন্ত-হীন বৈচিত্র্যকে সে আমল দেয় না।

যে-কোনো তেলেনা নিয়ে যদি পরীক্ষা ক'রে দেখি তবে দেখতে পাব যে, তার সুরগুলিকে কাটা-কাটা রাখলে একই রাগিণীর দ্বারা নানা প্রকার হৃদয় ভাবের বর্ণনা হোতে পারে। কিন্তু সুরগুলিকে যদি গড়ানে ক'রে পরস্পরের গায়ে হেলিয়ে গাওয়া যায় তাহোলে হৃদয়-ভাবের বিশেষ বৈচিত্র্য লেপে গিয়ে রাগিণীর সাধারণ ভাবটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এটা কেমনতরো? যেমন দেখা গেছে, খুড়তত, জাঠতত, মাসতত, পিসতত প্রভৃতি অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পারিবারিক শ্রুতিসুরের বাঁধনে যে ছেলেটি অত্যন্ত ঠাসা হয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, সেই ছেলেই বৃহৎ পরিবার থেকে বার হয়ে জাহাজের খালাসিগিরি ক'রে নিঃসম্বলে আমেরিকায় গিয়ে আজ খুবই শক্ত সমর্থ সজীব সতেজভাবে ধড়ফড় ক'রে বেড়াচ্চে। আগে সে পরিবারের ঠেলা গাড়িতে পূর্ব্বপুরুষের রাস্তায় বাঁধা-বরাদ্দ-মতো হাওয়া খেত। এখন সে নিজে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে এবং তার রাস্তার সংখ্যা নেই। বাঁধন-ছাড়া সুরগুলো যে-গানকে গ'ড়ে তোলে তার খেয়াল নেই সে কোন্ শ্রেণীর, সে এই জানে যে "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।"

শুধুমাত্র রসকে ভোগ করা নয় কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করা যখন মানুষের অভিপ্রায় হয় তখন সে এই বিশেষত্বের বৈচিত্র্যকে ব্যক্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন সে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা হাসি কান্না সমস্তকে বিচিত্র রূপ দিয়ে আর্টের অমৃতলোক আপন হাতে সৃষ্টি করতে থাকে। আত্মপ্রকাশের এই সৃষ্টিই স্বাধীনতা। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার

অসম্পূর্ণ ব'লে একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হোত তবে আমাদের অধীনতা চিরন্তন হোত। তাহোলে যা-কিছু আছে তাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করত, আমরা তার উপব একটুও হাত চালাতে পারতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়েব বেড়ি হোত। শাসনতন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক্ তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে তবে তা সোনার দড়িতে চিরউদ্বন্ধন। মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলে পরামর্শ ক'রে যদি আমাদেব সঙ্গীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানতেই পারি সৃষ্টি করতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।

চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে-হিল্লোল তুলেছিল সে একটা শাস্ত্রছাড়া ব্যাপার। তাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যাকুল হোলো। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল স্থাবরভাবে ভোগ করে না, সচলভাবে সৃষ্টি করে। এইজন্য সেদিন কাব্যে ও সঙ্গীতে বাঙালি

আত্মপ্রকাশ করতে বসল। তখন পয়ার ত্রিপদীর বাঁধা ছন্দে প্রচলিত বাঁধা কাহিনী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা আর চলল না। বাঁধন ভাঙল—সেই বাঁধন বস্তুত প্রলয় নয়, তা সৃষ্টির উদ্যম। আকাশে নীহারিকার যে ব্যাপকতা তার একটা অপরূপ মহিমা আছে। কিন্তু সৃষ্টির অভিব্যক্তি এই ব্যাপকতায় নয়। প্রত্যেক তারা আপনাতে আপনি স্বতন্ত্র হয়ে নক্ষত্রলোকের বিরাট ঐক্যকে যখন বিচিত্র ক'রে তোলে তখন তাতেই সৃষ্টির পরিণতি। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কাব্যেই সেই বৈচিত্র্যচেষ্টা প্রথম দেখতে পাই। সাহিত্যে এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের উদ্যমকেই ইংরেজিতে রোম্যাণ্টিক মূভমেণ্ট বলে।

এই স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা কেবল কাব্যছন্দের মধ্যে নয়, সঙ্গীতেও দেখা দিল। সেই উদ্যমের মুখে কালোয়াতি গান আর টিঁকল না। তখন সঙ্গীত এমন সকল সুর খুঁজতে লাগল যা হৃদয়াবেগের বিশেষত্বগুলিকে প্রকাশ করে, রাগরাগিণীর সাধারণ রূপগুলিকে নয়। তাই সেদিন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম শাস্ত্রিক পণ্ডিতের কাছে যেমন অবজ্ঞা পেয়েছিল ওস্তাদার কাছে কীর্ত্তন গানের তেমনিই অনাদর ঘটেছে।

আজ নূতন যুগের সোনার কাঠি আমাদের অলস মনকে ছুঁয়েছে। কেবল ভোগে আর আমাদের তৃপ্তি নেই, আমাদের আত্মপ্রকাশ চাই। সাহিত্যে তার পরিচয় পেয়েছি। আমাদের নূতন-জাগরূক চিত্রকলাও পুরাতন রীতির আবরণ কেটে আত্মপ্রকাশের বৈচিত্র্যের দিকে উদ্যত। অর্থাৎ স্পষ্টই দেখ্‌ছি আমরা পৌরাণিক যুগের বেড়ার বাইরে এলেম। আমাদের সাম্‌নে এখন জীবনের বিচিত্র পথ উদ্‌ঘাটিত। নূতন নূতন উদ্ভাবনের মুখে আমরা চল্‌ব। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন চিত্রকলা সবই আজ অচলতার বাঁধন হতে ছাড় পেয়েছে। এখন আমাদের সঙ্গীতও যদি এই বিশ্ব-যাত্রার তালে তাল রেখে না চলে তবে ওর আর উদ্ধার নেই।

হয়তো সেও চল্‌তে সুরু করেছে। কিছুদূর না এগোলে তার হিসাব পাওয়া যাবে না। একদিক থেকে দেখলে মনে হয় যেন গানের আদর দেশ হতে চলে গেছে। ছেলেবেলায় কলকাতায় গাইয়ে বাজিয়ের ভিড় দেখেছি; এখন একটি খুঁজে মেলা ভার, ওস্তাদ যদি বা জোটে শ্রোতা জোটানো আরো কঠিন। কালোয়াতি বৈঠকে শেষ পর্য্যন্ত সবল অবস্থায় টিকতে

পারে এমন ধৈর্য্য ও বীর্য্য একালে দুর্লভ। এটা আক্ষেপের বিষয়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মিল না রাখতে পারলে বড়ো বড়ো মজবুৎ জিনিসও ভেঙে পড়ে। এমন কি হাল্‌কা জিনিস শীঘ্র ভাঙে না, ভাঙবার বেলায় বড়ো জিনিসই ভাঙে। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় ভগ্নাবশেষে। অন্ততঃ তার ধারা আর সচল নেই। অথচ কুঁড়েঘর আগে যেমন ক'রে তৈরি হোত এখনো তেমনি ক'রে হয়। কেননা প্রাচীন স্থাপত্য যে-সকল রাজা ও ধনীব বিশেষ প্রয়োজনকে আশ্রয় করেছিল তাবাও নেই সেই অবস্থারও বদল হয়েছে। কিন্তু দেশের যে-জীবনযাত্রা কুঁড়ে ঘরকে অবলম্বন ক'রে তার কোনো বদল হয়নি।

আমাদের সঙ্গীতও রাজ-সভা সম্রাট-সভায় পোষ্য-পুত্রের মতো আদরে বাড়ছিল। সে সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নেই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্য-সঙ্গীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নেই। কেননা, এরা যে-রসে লালিত সেই জীবনের ধাবা চিরদিনই চলছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকলে বড়ো শিল্পও টি কতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের জীবন কেবল গ্রাম্য নয়। তার উপরেও আর একটা বৃহৎ লোকস্তর জমে উঠেছে যার সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর যোগ ঘটল। চিরাগত প্রথার খোপখাপের মধ্যে সেই আধুনিক চিত্তকে আর কুলোয় না। তা নূতন নূতন উপলব্ধির পথ দিয়ে চলেছে। আর্টের যে-সকল আদর্শ স্থাবর, তার সঙ্গে এর গতির যোগ রইল না, বিচ্ছেদ বাড়তে লাগল। এখন আমরা দুই যুগের সন্ধিস্থলে। আমাদের জীবনের গতি যেদিকে, জীবনের নীতি সম্পূর্ণ সেদিকের মতো হয়নি। দুটোতে ঠোকাঠুকি চলছে। কিন্তু যেটা সচল তারই জিৎ হবে।

এই যে আমাদের নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, গানের মধ্যে এর কিছু-কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই একদিকে গান-বাজনার 'পরে অনাদরও যেমন লক্ষ্য করা যায় আরেকদিকে তেমনি আদরও দেখছি। আজকাল ঘরে ঘরে হার্ম্মোনিয়ম, গ্রামোফোন, পাড়ায় পাড়ায় কন্সর্ট। এতে অনেকটা রুচিবিকার দেখা যায়। কিন্তু চিনি জ্বাল দেবার গোড়ার বলকে রসে অনেকটা পরিমাণ গাদ ভেসে ওঠে। সেই গাদ কাটতে কাটতেই রস ক্রমে গাঢ় ও নির্ম্মল হয়ে আসে। আজ

টগ্‌বগ্‌ শব্দে সঙ্গীতের সেই গাদ ফুটছে; পাড়ায় টেঁকা দায়। কিন্তু সেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। সু-খবরটা এই যে চিনিব জ্বাল চড়ানো হয়েছে।

গানবাজনার সম্বন্ধে কালের যে বদল হয়েছে তার প্রধান লক্ষণ এই যে, আগে যেখানে সঙ্গীত ছিল রাজা, এখন সেখানে গান হয়েছে সর্দ্দার। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ গান শোনবার জন্যই এখনকার লোকের আগ্রহ, রাগরাগিণীর জন্য নয়। সেই সকল বিশেষ গানের জন্যই গ্রামোফোনেব কাট্‌তি। যুবক মহলে গায়কেব আদর সে গান জানে ব'লে, সে ওস্তাদ ব'লে নয়।

পূর্ব্বে ছিল দস্তুরেব মই দিয়ে সমতল-করা চষা জমি। এখন তা ফুঁড়ে' নানাবিধ গানের অঙ্কুর দেখা দিচ্চে। ওস্তাদের ইচ্ছা এদের উপব দিয়ে দস্তুরের মই চালায়। কেননা যার প্রাণ আছে তার নানান্‌ খেয়াল, দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সইতে পারে না। শাসনকেই সে বড়ো ব'লে জানে, প্রাণকে নয়।

কিন্তু সরস্বতীকে শিকল পরালে চলবে না, সে

শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরি হোলেও নয়। কেননা মনের বেগই সংসারে সব চেয়ে বড়ো বেগ। তাকে ইণ্টারন্ ক'রে যদি সলিটরি সেল্-এর দেয়ালে বেড়ে রাখা যায় তবে তাতে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা হবে। সংসারে কেবলমাত্র মাঝারির রাজত্বেই এমন সকল নিদারুণতা সম্ভবপর হয়। যারা বড়ো, যারা ভূমাকে মানে তারা সৃষ্টি করতেই চায় দমন করতে চায় না। এই সৃষ্টির ঝঞ্ঝাট বিস্তর, তার বিপদও কম নয়। বড়ো যারা তারা সেই দায় স্বীকার ক'রেও মানুষকে মুক্তি দিতে চায়, তারা জানে মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর মাঝারির শাসন। এই শাসনে যা-কিছু সবুজ তা হল্‌দে হয়ে যায়, যা কিছু সজীব তা কাঠ হয়ে ওঠে।

এইবার এই বর্ত্তমান আনাড়ি লোকটার অপথযাত্রার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দুই একটা কথায় ব'লে নিই। কেননা গান সম্বন্ধে আমি যেটুকু সঞ্চয় করেছি তা ঐ অঞ্চল হতেই। সাহিত্যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়েছিলেম খুব অল্প বয়সেই। তখন ভদ্র গৃহস্থের কাছে অনেক তাড়া খেয়েছি। সঙ্গীতেও আমার ব্যবহারে শিষ্টতা ছিল না। তবু সে-মহল থেকে পিঠের উপর বাড়ি

যে কম পড়েছে তার কারণ এখনকার কালে সে-দিকটার দেউড়িতে লোকবল বড়ো নেই।

তবু যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হোতে পারি নি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তাদেরই বজায় থাকে। আমার বিশ্বাস এই রকমটাই চলবে। কেননা আর্টের পায়ের বেড়িটাই দোষের, কিন্তু তার চলার বাঁধা পথটায় তাকে বাঁধে না।

আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীত রচনাতেও সুর-গুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বেঁধে দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলনে। কিন্তু পরমাণু দিয়ে গাছের বিচার হয় না, কেননা তারা বিশ্বের সামগ্রী, এই কোষগুলিই গাছের।

তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি সুর বিশেষ-ভাবে মিলিত হোলে তারাই গানের জীবকোষ হয়ে ওঠে। এই সব দানা-বাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজিয়ে রচয়িতা গান বাঁধেন। তাই য়ুরোপীয় গান শুনতে শুনতে যখন অভ্যাস হয়ে আসে তখন তার স্বরসংস্থানের কোষ-গঠনের চেহারাটা দেখতে পাওয়া

সহজ হয়। এই স্বর-সংস্থানটা রূঢ়ী নয় এ যৌগিক। তবেই দেখা যাচ্চে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হয়ে ওঠে। সেই ঠাট-গুলিকে নিয়েই গান তৈরি করতে হয়।

এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। রাজমিস্ত্রী ইট সাজিয়ে ইমারত তৈরি করে। কিন্তু তার হাতে ইঁট না দিয়ে যদি এক-একটা আস্ত তৈরি দেয়াল কিম্বা মহল দেওয়া যেত তবে ইমারৎ গড়ায় তার নিজের বাহাদুরী তেমন বেশি থাকত না। সুরের ঠাটগুলি ইঁটের মতো হোলেই তাদের দিয়ে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ করা যায়, দেয়াল কিম্বা আস্ত মহলের মতো হোলেই তাদের দিয়ে জাতিগত সাধারণতাই প্রকাশ করা যায়। আমাদের দেশের গানের ঠাঠ এক-একটা বড়ো বড়ো ফালি, তাকেই বলি রাগিণী।

আজ সেই ফালিগুলাকে ভেঙে চুরে সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামতো কোঠা গড়বার চেষ্টা চলছে। কিন্তু টুক্‌রাগুলি যতই টুক্‌রা হোক্ তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিষটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাদের জুড়তে গেলে সেই আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি এসে পড়ে।

এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে স্বাধীন হোতে পারি না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে যদি লক্ষ্য থাকে তবে এই বাঁধন আমাদের বাধা দিতে পারবে না। সকল আর্টেই প্রকাশের উপকরণমাত্রই একদিকে উপায় আর-একদিকে বিঘ্ন। সেই সব বিঘ্নকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে, কখনো তার সঙ্গে লড়াই কখনো বা আপোস করতে করতে আর্ট বিশেষভাবে শক্তি, নৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করে। যে উপকরণ আমাদের জুটেছে তার অসম্পূর্ণতাকেও খাটিয়ে নিতে হবে, সেও কাজে লাগবে।

আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর উপাদানগুলিকে পেয়েছি। সুতরাং যে-ভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলে থাকবেই। আমাদের রাগিণীর সেই সাধারণ বিশেষত্বটি কেমন, যেমন আমাদের বাংলা দেশের খোলা আকাশ। এই অবারিত আকাশ আমাদের নদীর সঙ্গে, প্রান্তরের সঙ্গে, তরুচ্ছায়ানিভৃত গ্রামগুলির সঙ্গে নিয়ত লেগে থেকে তাদের সকলকেই বিশেষ একটি ঔদার্য্য দান করছে। যে-দেশে পাহাড়গুলো উঁচু হয়ে আকাশের মধ্যে বাঁধ বেঁধেছে সেখানে পার্ব্বতী প্রকৃতির ভাবখানা আমাদের প্রান্তরবাসিনীর সঙ্গে স্বতন্ত্র। তেমনি

আমাদের দেশের গান যেমন ক'রেই তৈরি হোক্ না কেন, রাগরাগিণী সেই সর্ব্বব্যাপী আকাশের মতো তাকে একটি বিশেষ নিত্যরস দান করতে থাকবে।

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা ক'রে দেখি তবে দেখতে পাব যে, তাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই কিন্তু ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ। কিন্তু বাউলের সুর যে একঘ'রে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক্ সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।

এমনি ক'রে আমাদের আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হ'য়ে উঠবে বটে কিন্তু তবুও তারা একটা বড়ো আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হবে না। তাদের জাত যাবে বটে কিন্তু

জাতি যাবে না। তারা সচল হবে, তাদের সাহস বাড়বে, নানারকম সংযোগের দ্বারা তাদের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটে উঠবে।

একটা উপমা দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। আমাদের দেশের বিপুলায়ত পরিবারগুলি আজকাল আর্থিক ও অন্যান্য কারণে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সেই টুক্‌রা পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই বেড়েছে। তবু সেই পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার ভাবটা আমাদের মন হতে যায় না। এমন কি, বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও এটা ফুটে ওঠে। এইটেই আমাদের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব নিয়ে ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে আমাদের জীবনটা টিকটিকির কাটা লেজের মতো কিম্বা কন্সার্টের তারস্বর গৎগুলার মতো নীরস খাপছাড়া হবে না, তা চারদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হবে। তা নিজের একটি বিশেষ রসও রাখবে অথচ স্বাতন্ত্র্যের শক্তিও লাভ করবে।

একটা প্রশ্ন এখনো আমাদের মনে রয়ে গেছে তার উত্তর দিতে হবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যে-হার্ম্মনি অর্থাৎ স্বরসঙ্গতি আছে আমাদের সঙ্গীতে তা চলবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, "না, ওটা

আমাদের গানে চলবে না, ওটা য়ুরোপীয়।” কিন্তু হার্ম্মনি য়ুরোপীয় সঙ্গীতে ব্যবহার হয় ব’লেই যদি তাকে একান্তভাবে য়ুরোপীয় বলতে হয়, তবে এ কথাও বলতে হয়, যে, যে-দেহতত্ত্ব অনুসারে য়ুরোপে অস্ত্র-চিকিৎসা চলে সেটা য়ুরোপীয়, অতএব বাঙালির দেহে ওটা চালাতে গেলে ভুল হবে। হার্ম্মনি যদি দেশবিশেষের সংস্কারগত কৃত্রিম সৃষ্টি হোত তবে তো কথাই ছিল না। কিন্তু যে-হেতু এটা সত্যবস্তু, এর সম্বন্ধে দেশ-কালের নিষেধ নেই। এর অভাবে আমাদের সঙ্গীতের যে অসম্পূর্ণতা সেটা যদি অস্বীকার করি তবে তাতে কেবলমাত্র কণ্ঠের জোর বা দম্ভের জোর প্রকাশ পাবে।

তবে কিনা এও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্ম্মনি ব্যবহার করতে হোলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলে চলতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে স্পর্দ্ধা হবে। আমাদের দেশে ঐ বড়ো সুরটা চিরদিন ফাঁকায় থেকে চারিদিকে খুব ক’রে ডালপালা মেলেছে। তার সেই স্বভাবকে ক্লিষ্ট করলে তাকে মারা হবে। শীতদেশের মতো অত্যন্ত ঘন ভিড় আমাদের ধাতে সয় না। অতএব আমাদের

গানের পিছনে যদি স্বরানুচর নিযুক্ত থাকে তবে দেখতে হবে তা'রা যেন পদে পদে আলো হাওয়া না আটকায়।

ব'সে যে থাকে তার সাজসজ্জা প্রচুর ভারি হোলেও চলে, কিন্তু চলাফেরা করতে হোলে বোঝা হাল্কা করা চাই। লোকসান না ক'রে হাল্‌কা করবার ভালো উপায় বোঝাটাকে ভাগ ক'রে দেওয়া। আমাদেব গানেব বিপুল তান-কর্ত্তব ঐ হার্ম্মনি বিভাগে চালান ক'রে দিলে মূল গানটাব সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য্য বক্ষা পায় অথচ তাব গতিপথ খোলা থাকে। এক হাতে রাজদণ্ড, অন্য হাতে বাজছত্র, কাঁধে জয়ধ্বজা এবং মাথায় সিংহাসন বয়ে বাজাকে যদি চলতে হয় তবে তাতে বাহাদুবী প্রকাশ পায় বটে কিন্তু তার চেয়ে শোভন ও সুসঙ্গত হয় যদি এই আসবাবগুলি নানা-স্থানে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়। তাতে সমাবোহ বাড়ে বই কমে না। আমাদের গানের যদি অনুচর বরাদ্দ হয় তবে সঙ্গীতের অনেক ভারী ভাবী মালপত্র ঐদিকে চালান ক'রে দিতে পারি। যাই হোক্ আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে একটা বড়ো মহল ফাঁকা আছে, এটা যদি দখল করতে পারি তবে এইদিকে

অনেক পরীক্ষা উদ্ভাবনার জায়গা পাব। যৌবনের স্বভাবসিদ্ধ সাহস যাঁদের আছে এবং লক্ষ্মীছাড়ার ক্ষ্যাপা হাওয়া যাঁদের গায়ে লাগল এই একটি আবিষ্কারের দুর্গমক্ষেত্র তাঁদের সামনে প'ড়ে। আজ হোক্ কাল হোক্ এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই লোক নামবে।

সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সবচেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান-বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি ক'রেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সঙ্গীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে। কেননা দুই ওস্তাদে দুই বিভাগ দখল করেছে—দুই মধ্যস্থের মধ্যে ঠেলাঠেলি—কর্ত্তৃত্বের আসন কে পায়—মাঝে থেকে সঙ্গীতের মধ্যে আত্মবিরোধ ঘটে।

তাল জিনিসটা সঙ্গীতের হিসাব-বিভাগ। এর দরকার খুবই বেশি সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াক্কড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হোতে থাকে। তবু আমাদের দেশে এই বাধাটাকে অত্যন্ত বড়ো করতে হয়েছে কেননা

মাঝারির হাতে কর্তৃত্ব। গান সম্বন্ধে ওস্তাদ অত্যন্ত বেশি ছাড়া পেয়েছে, এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে আরেক ওস্তাদ যদি তাকে ঠেকিয়ে না চলে তবে তো সে নাস্তানাবুদ করতে পারে। কর্তা যেখানে নিজের কাজের ভার নিজেই লন সেখানে হিসাব খুব বেশি কড়া হয় না। কিন্তু নায়েব যেখানে তাঁর হয়ে কাজ করে সেখানে কানাকড়িটার চুল-চেরা হিসাব দাখিল করতে হয়। সেখানে কণ্ট্রোলার আপিস কেবলি খিটিখিটি করে এবং কাজ চালাবার আপিস বেজার হয়ে ওঠে।

য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামতো মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ ক'রে হাঁফ ছাড়তে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুঝে' রচয়িতা নিজে তার সীমানা বেঁধে দেন, কোনো মধ্যস্থ এসে রাতারাতি সেটাকে বদল করতে পারে না। এতেই সুরেতালে রেষারেষি বন্ধ হয়ে যায়। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে তালের বোলটা মৃদঙ্গের মধ্যে নেই, তা হর্ম্মনি বিভাগে গানের অন্তরঙ্গ রূপেই একাসনে বিরাজ করে। লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও

সে তা নিয়ে লাঠিয়ালি করতে চায়, কেননা রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত সুরতালের কৌশল হয়ে ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেননা কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।

অনেক দিন থেকেই কবিতা লিখছি, এইজন্য, যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না ব'লে পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু-কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ নিয়ে যখন গান লিখতে বসলেম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যে রকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের ওস্তাদী দেবতা তেমনি ফোঁস ক'রে উঠলেন। আমার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে-নিয়ম আছে তা বিধাতার গড়া নিয়ম, তা কামারের গড়া নিগড় নয়। সুতরাং তার সংযমে সঙ্কীর্ণ করে না, তাতে বৈচিত্র্যকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। সেই কথা মনে রেখে বাংলা কাব্যে ছন্দকে বিচিত্র করতে সঙ্কোচ বোধ করি নি।

কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলবে এই ভরসা ক'রে গান বাঁধতে চাইলেম।

তাতে কী উৎপাত ঘটল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক্ আমার গানের কথাটি এই ঃ—

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমার নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি 'পরে ভরভর।
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া-স্বপনে যে, মরি মরি,
নিবিড় কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর।

এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করলেন না। তাই সাহস ক'রে ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাইলেম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুসি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন, এ-ছন্দের এক অংশে সাত আর-এক অংশে চার, কিছুতেই তাল মেলে না। আমার জবাব এই,

তাল যদি না মেলে সেটা তালেরই দোষ। ছন্দটাতে দোষ হয় নি, কেন, তা বলি। এই ছন্দ তিন এবং চার মাত্রার যোগে তৈরি। এইজন্যই "তোমার নীলবাসে" এই সাত মাত্রার পর "নিল কায়া" এই চারমাত্রা খাপ খেল। তিন মাত্রা হোলেও ক্ষতি হোত না—যেমন, "তোমার নীলবাসে মিলিল।" কিন্তু এর মধ্যে ছয় মাত্রা কিছুতেই সইবে না। যেমন "তোমারি নীলবাসে ধরিল শরীর।" অথচ প্রথম অংশে যদি ছয়ের ভাগ থাক্‌ত তবে দিব্য চল্‌ত, যেমন, "তোমার সুনীল বাসে ধরিল শরীর।" এ আমি বলছি কানের স্বাভাবিক রুচির কথা। এই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবার পথ। অতএব এই কানের কাছে যদি ছাড় মেলে তবে ওস্তাদকে কেন ডরাব?

আমার দৃষ্টান্তগত ছন্দটিতে প্রত্যেক লাইনেই সব-সুদ্ধ ১১ মাত্রা আছে। কিন্তু এমন ছন্দ হোতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা বিভাগ নেই। যেমন :—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি'
অধরে লাজহাসি সাজিবে।

নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগ-রাজীবে।

এর প্রথম দুই লাইনে মাত্রা ভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৪=১৪। আমার মতে এই বৈচিত্র্যে ছন্দের মিষ্টতা বাড়ে। অতএব উৎসাহ ক'রে গান ধরলাম। কিন্তু এক ফের ফিরতেই তালওয়ালা পথ আটক ক'রে বসল। সে বল্‌ল, "আমার সমের মাশুল চুকিয়ে দাও!" আমি তো বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান মহারাজার উচ্চ আদালতে দরবার করে খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাইরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ্‌ ক'রে হাত চেপে ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়, রাজার দোহাই মানে না।

কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপ্ত করে আছে; আকাশের তারা থেকে পতঙ্গের পাখা পর্য্যন্ত সমস্তই এ'কে মানে ব'লেই বিশ্বসংসার এমন ক'রে চলেছে অথচ ভেঙে পড়্‌ছে না। অতএব কাব্যেই কী গানেই কী এই লয়কে যদি

মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘট্‌লেও ভয় কর্‌বার প্রয়োজন নেই।

একটি দৃষ্টান্ত দিই :—

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে'।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি
পুলকে উঠে দুলে' দুলে'।
বেদনা সুমধুর হ'য়ে
ভুবনে গেল আজি বয়ে।
বাঁশিতে মায়া তান পূরি'
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি'
বিরহ-সাগরের কূলে।

এটা যে কী তাল তা আমি আনাড়ি জানি না। এবং কোনো ওস্তাদও জানেন না। গ'ণে দেখলে দেখি প্রত্যেক লাইনে নয় মাত্রা। যদি এমন বলা যায় যে, না হয় নয় মাত্রায় একটা নূতন তালের সৃষ্টি করা

যাক্ তবে আর একটা নয় মাত্রার গান পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্—

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
  সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
  সে বাঁধনে তা'রে বাঁধিল।
পথে পথে তারে খুঁজিনু
মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
  আমারেও সে যে সাধিল।
এসেছিল মন হরিতে
  মহা পারাবার পারায়ে
ফিরিল না আর তরীতে
  আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনার মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে
  কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

এও নয় মাত্রা কিন্তু এর ছন্দ আলাদা। প্রথমটার

লয় ছিল তিনে ছয়ে, দ্বিতীয়টার লয় ছয়ে তিনে। আরো একটা দেখা যাক্।

দুয়ার মম পথ পাশে
সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
শ্রাবণ শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুন শুনি বায়ুবেগে
জাগায় মৃদু মরমর,
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তারি থাকি থাকি।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি॥
সবাই দেখি যায় চলে
পিছন পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে
পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ মেঘ ভেসে ভেসে
উধাও হয়ে যায় দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
গোপন কোন্ সুরপুরে,—

স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
উদাস মোর প্রাণ পাখী।
কখন্ তার রথ আসে
ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি।

চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ। কিন্তু এই বারো মাত্রা রক্ষা কর্‌লেও চৌতালকে রক্ষা করা যায় না এমন হয়। এই তো বারো মাত্রা:—

বনের পথে পথে বাজিছে বায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে!
কাটিয়া যায় বেলা মনের ভুলে,
বাতাস উদাসিছে আকুল চুলে,
ভ্রমর মুখরিত বকুল ছায়ে
নূপুর রুনুরুনু কাহার পায়ে।

এ চৌতালও নয়, একতালাও নয়, ধামারও নয়, ঝাঁপতালও নয়। লয়ের হিসাব দিলেও তালের হিসাব মেলে না। তালওয়ালা সেই গরমিল নিয়ে কবিকে দায়িক করে।

কিন্তু হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাৎ চল্‌বে না। আমরা শাসন মান্‌ব, তাই ব'লে অত্যাচার মান্‌ব না। কেননা যে-নিয়ম সত্য সে-নিয়ম বাইরের জিনিস নয়,

তা বিশ্বের ব'লেই তা আমার আপনার। যে-নিয়ম ওস্তাদের তা আমার ভিতরে নেই, বাইরে আছে; সুতরাং তাকে অভ্যাস ক'রে বা ভয় ক'রে বা দায়ে প'ড়ে মান্‌তে হয়। এই রকম মানার দ্বারাই শক্তির বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গীতকে এই মানা থেকে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরূপকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত কর্‌তে থাকবে।

সঞ্চয় করাও নয়, ভোগ করাও নয়, কিন্তু আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার যে প্রেরণা, তাতেই আপনার বিকাশ। গান যদি কেবল বৈঠকখানার ভোগ বিলাস হয় তবে তাতে নির্জ্জীবতা প্রমাণ করে। প্রকাশের যত রকম ভাষা আছে সমস্তই মানুষের হাতে দিতে হবে। কেননা যে পরিমাণে মানুষ বোবা সেই পরিমাণে সে দুর্ব্বল, সে অসম্পূর্ণ। এই জন্য ওস্তাদের গড়খাই-করা গানকে আমাদের সকলের করা চাই। তাহোলে জীবনের ক্ষেত্রে গানও বড়ো হবে, সেই গানের সম্পদে জীবনও বড়ো হবে।

দেশের সকল শক্তিই আজ জরাসন্ধের কারাগারে বাঁধা পড়েছে। তারা আছে মাত্র, তারা চলে না—দস্তুরের বেড়িতে তারা বাঁধা। সেই জরার দুর্গ ভেঙে

আমাদের সমস্ত বন্দী শক্তিকে বিশ্বে ছাড়া দিতে হবে। তা সে কী গানে, কী সাহিত্যে, কী চিন্তায়, কী কর্ম্মে, কী রাষ্ট্রে, কী সমাজে! এই ছাড়া-দেওয়াকে যারা ক্ষতি-হওয়া মনে করে তারাই কৃপণ, তারাই আপনার সম্পদ হতে আপনি বঞ্চিত, তারাই অন্ন-পূর্ণার অন্নভাণ্ডারে ব'সে উপবাসী। যারা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে তারাই হারায়, যারা মুক্তির ক্ষেত্রে ছেড়ে রাখে তারাই রাখে।

১৩২৪

পরিশিষ্ট
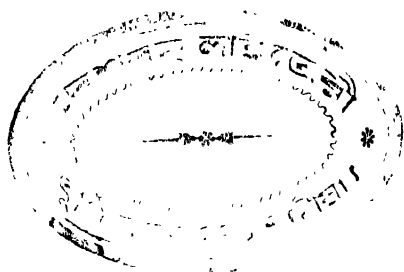
পত্র

[কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডার্সন
মহাশয়কে লিখিত]

* * * আপনি বলেছেন আমাদের উচ্চারণের ঝোঁকটা বাক্যের আরম্ভে পড়ে;—এ আমি অনেক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্য করেছি। ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটি নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই আপনাদের ছন্দ সঙ্গীতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃত ভাষার ঝোঁক নেই কিন্তু দীর্ঘ হ্রস্ব স্বর ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাবৈচিত্র্য আছে, তাতে সংস্কৃত ছন্দ ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। যথা—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

উক্ত বাক্যের যেখানে যেখানে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা দীর্ঘস্বর আছে সেখানেই ধ্বনি গিয়ে বাধা পায়। সেই বাধার আঘাতে আঘাতে ছন্দ হিল্লোলিত হয়ে ওঠে।

যে ভাষায় এইরূপ প্রত্যেক শব্দের একটি বিশেষ বেগ আছে সে ভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, প্রত্যেক

শব্দটিই নিজেকে জানান দিয়ে যায়, কেহই পাশ কাটিয়ে আমাদের মনোযোগ এড়িয়ে যেতে পারে না। এজন্য যখন একটা বাক্য (Sentence) আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তখন তার উঁচুনিচুর বৈচিত্র্য-বশত একটা সুস্পষ্ট চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে একসঙ্গে অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়ে পিছলিয়ে চলে যায়; তাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না। ঠিক যেন আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মতো। বাড়ির কর্ত্তাটিকেই স্পষ্ট ক'রে অনুভব করা যায় কিন্তু তাঁর পশ্চাতে তাঁর কত পোষ্য আছে, তারা আছে কি নেই, তা'র হিসেব রাখবার দরকার হয় না।

এজন্য দেখা যায় আমাদের দেশে কথকতা যদিচ জনসাধারণকে শিক্ষা এবং আমোদ দেবার জন্যে তবু কথকমশায় ক্ষণে ক্ষণে তার মধ্যে ঘনঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃত সমাসের আমদানি ক'রে থাকেন। সে সকল শব্দ গ্রাম্যলোকেরা বোঝে না কিন্তু এ সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে তাদের মনটা ভালো ক'রে জেগে ওঠে। বাংলা ভাষায় শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু ব'লে অনেক

সময় আমাদের কবিদেরকে দায়ে প'ড়ে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হয়।

এজন্যই আমাদের যাত্রাব ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অনুপ্রাস ব্যবহারের প্রথা আছে। সে অনুপ্রাস অনেক সময় অর্থহীন এবং ব্যাকরণবিরুদ্ধ; কিন্তু সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষে তার প্রয়োজন এত অধিক যে, বাছ-বিচার করবার সময় পাওয়া যায় না। নিরামিষ তরকারি রাঁধতে হোলে ঝাল-মসলা বেশি ক'রে দিতে হয়, নইলে স্বাদ পাওয়া যায় না। এ মসলা পুষ্টির জন্য নয়; এ কেবলমাত্র রসনাকে তাড়া দিয়ে উত্তেজিত করবার জন্য। সেজন্য দাশরথী রায়েব রামচন্দ্র যখন নিম্নলিখিত রীতিতে অনুপ্রাসচ্ছটা বিস্তার ক'রে বিলাপ করতে থাকেন—

> "অতি অগণ্য কাজে ছি ছি জঘন্য সাজে
> ঘোর অরণ্য মাঝে কত কাঁদিলাম।"

তাতে শ্রোতার হৃদয় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আমাদের বন্ধু দীনেশবাবুকর্ত্তৃক পরম-প্রশংসিত কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের গানের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকারের আবর্জ্জনা ঝুড়ি ঝুড়ি চেপে আছে। তাতে কা'কেও বাধা দেয় না।
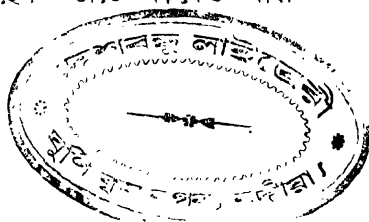
পুনঃ যদি কোনক্ষণে দেখা দেয় কমলেক্ষণে
যতনে ক'রে রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে।”

এখানে কমলেক্ষণ এবং রক্ষণ শব্দটাতে এ-কার যোগ করা একেবারেই নিরর্থক; কিন্তু অনুপ্রাসের বন্যার মুখে অমন কত এ-কার উ-কার স্থানে-অস্থানে ভেসে বেড়ায় তাতে কারো কিছু আসে যায় না।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন-কাব্য গানের সুরে কীর্ত্তিত হোত। এ জন্য শব্দের মধ্যে যা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যা কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরে উঠত; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুল্‌ত, করতাল চলত, এবং মৃদঙ্গ বাজতে থাক্‌ত। সে সমস্ত বাদ দিয়ে যখন আমাদের সাধু-সাহিত্য-প্রচলিত ছন্দগুলি পড়ে দেখি, তখন দেখতে পাই একে তো প্রত্যেক কথাটিতে স্বতন্ত্র ঝোঁক নেই, তাতে প্রত্যেক অক্ষরটি একমাত্রা ব'লে গণ্য হয়েছে।

গানের পক্ষে এইটেই সুবিধে। বাংলার সমতল-ক্ষেত্রে নদীর ধারা যেমন স্বচ্ছন্দে চারদিকে শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হয়েছে, তেমনি সম-মাত্রিক ছন্দে সুর আপন প্রয়োজন মতো যেমন-তেমন ক'রে চল্‌তে পারে।

কথাগুলো মাথা হেঁট ক'রে সম্পূর্ণ তার অনুগত হয়ে থাকে।

কিন্তু সুর হতে বিযুক্ত ক'রে পড়তে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হয়ে পড়ে। এ জন্য আজ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতা পড়তে হোলে আমরা সুর ক'রে পড়ি। এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমাণে সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই এরূপ ঘটেছে। আমাদের এই অভ্যাসবশতঃ ইংরেজি পড়বার সময়েও আমরা সুর লাগাই; ইংরেজের কানে নিশ্চয়ই তা অদ্ভুত লাগে।

কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্ষরটিই যে বস্তুত একমাত্রার এ কথা সত্য নয়। যুক্ত বর্ণ এবং অযুক্ত বর্ণ কখনই একমাত্রার হোতে পারে না।

"কাশিরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

"পুণ্যবান" শব্দটি "কাশিরাম" শব্দের সমান ওজনের নয়। কিন্তু আমরা প্রত্যেক বর্ণটিকে সুর ক'রে টেনে টেনে পড়ি ব'লে আমাদের শব্দগুলোর মধ্যে এতটা ফাঁক থাকে যে, হাল্কা ও ভারি দুরকম শব্দই সমমাত্রা অধিকার করতে পারে।

Equality, Fraternity প্রভৃতি পদার্থগুলি খুব

মূল্যবান বটে কিন্তু সে জন্যই ঝুটা হোলে তা ত্যাজ্য হয়। আমাদের সাধুছন্দে বর্ণগুলির মধ্যে যে সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য দেখা যায় তা গানের সুরে সাঁচ্চা হোতে পারে কিন্তু আবৃত্তি ক'রে পড়বার প্রয়োজনে তা ঝুটা। এ কথাটা অনেকদিন আমার মনে বেজেছে। কোনো কোনো কবি, ছন্দের এই দীনতা দূর করবার জন্য বিশেষ জোর দেবার বেলায় বাংলা শব্দগুলিকে সংস্কৃতের রীতি অনুযায়ী স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ রেখে ছন্দে বসাবার চেষ্টা করেছেন; ভারতচন্দ্রে তার দুএকটা নমুনা আছে, যথা :—

মহারুদ্র বেশে মহাদেব সাজে।

বৈষ্ণব কবিদের রচনায় এরূপ অনেক দেখা যায়, কিন্তু এগুলি বাংলা নয় বললেই হয়। ভারতচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত ছন্দে লিখেছেন, সেখানে তিনি বাংলা শব্দ যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করেছেন এবং বৈষ্ণব কবিরা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা মৈথিলি ভাষার বিকার।

আমার বড়োদাদা মাঝে মাঝে এ কাজ করেছেন, কিন্তু তা কৌতুক ক'রে। যথা :—

ইচ্ছা সম্যক ভ্রমণ গমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি।
পায়ে শিক্লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি।

বাংলায় এ জিনিষ চলবে না; কারণ বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘস্বরের পরিমাণভেদ সুব্যক্ত নয়। কিন্তু যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ বাংলাতেও না ঘ'টে থাকতে পারে না।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার একটা প্রভেদ এই যে, বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই শব্দের অন্তস্থিত অ-স্বরবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যেমন—ফল, জল, মাঠ, ঘাট, চাঁদ, ফাঁদ, বাঁদর, আদর ইত্যাদি। ফল শব্দ বস্তুত একমাত্রার কথা। অথচ সাধু বাংলা ভাষার ছন্দে একে দুই মাত্রা ব'ল ধরা হয়। অর্থাৎ ফলা এবং ফল বাংলা ছন্দে একই ওজনের। এইরূপে বাংলা সাধুছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানো হয় না। অথচ জিনিসটা ধ্বনি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটা স্বরবর্ণের বাধা পায় না ব'লে পরবর্ত্তী শব্দের ঘাড়ের উপর প'ড়ে তাকে ধাক্কা দেয় ও বাজিয়ে তোলে। "করিতেছি" শব্দটা ভোঁতা। ওতে কোনো সুর বাজে না; কিন্তু "কচ্চি" শব্দে একটা সুর আছে। "যাহা হইবার তাহাই হইবে" এই বাক্যের ধ্বনিটা অত্যন্ত ঢিলে; সেই জন্য এর অর্থের মধ্যেও একটা আলস্য প্রকাশ পায়।

কিন্তু যখন বলা যায় "যা হবার তাই হবে" তখন "হবার" শব্দের হসন্ত-"র" "তাই" শব্দের উপর আছাড় খেয়ে একটা জোর জাগিয়ে তোলে; তখন ওর নাকি সুর ঘুচে গিয়ে ওর থেকে একটা "মরিয়া" ভাবের আওয়াজ বেরয়। বাংলার হসন্ত-বর্জ্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্ব্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা প'ড়ে গেছে, এবং তার চিক্কণতা যতই থাক্, তার জোর অতি অল্পই।

কিন্তু বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরালো ভাষা—এবং তার চেহারা ব'লে একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয়নি; কিন্তু তাই ব'লে অসাধু ভাষা যে বাসায় গিয়ে ম'রে আছে তা নয়। সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলা দেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল ক'রে ছেয়ে রয়েছে। কেবল ছাপার কালীর তিলক প'রে সে ভদ্র-সাহিত্য-সভায় মোড়লি ক'রে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তার কণ্ঠে গান থামে নি, তার বাঁশের বাঁশি বাজছেই। সেই

সব মেঠো-গানের ঝরণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত-শব্দগুলা নুড়ির মতো পরস্পরের উপর প'ড়ে ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দ কর্‌ছে। আমাদের ভদ্র সাহিত্য-পল্লীর গম্ভীর দীঘিটার স্থির জলে সেই শব্দ নেই;—সেখানে হসন্তর ঝঙ্কার বন্ধ।

আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চল্‌তি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করেছি। কেননা দেখেছি চল্‌তি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে—তার নিজের একটি কলধ্বনি আছে। "গীতাঞ্জলি" হতে আপনি আমার যে লাইনগুলি তুলে দিয়েছেন তা আমাদের চল্‌তি ভাষার হসন্ত সুরের লাইন।

আমার্‌ সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুট্‌বে গো ফুল্‌ ফুট্‌বে।
আমার্‌ সকল্‌ ব্যথা রঙীন্‌ হয়ে
গোলাপ্‌ হয়ে উঠ্‌বে।

আপনি লক্ষ্য ক'রে দেখবেন এই ছন্দের প্রত্যেক গাঁঠে গাঁঠে একটি ক'রে হসন্তের ভঙ্গী আছে। "ধন্য" শব্দটার মধ্যেও একটা হসন্ত আছে। উহা "ধন্‌ন"

এই বানানে লেখা যেতে পারে। এইটে সাধুভাষার ছন্দে লিখলাম—

> যত কাঁটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে ;
> সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে।

অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি একমাত্রা ব'লে ধরা যায় তবে এমন হোতে পারে—

> সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুম স্তবক ফুটিবে।
> বেদনা যন্ত্রণা রক্তিমচ্ছবি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে।

এমনি ক'রে সাধুভাষার কাব্যসভায় যুক্তবর্ণের মৃদঙ্গটা আমরা ফুটা ক'রে দিয়েছি এবং হসন্তর বাঁশির ফাঁকগুলি শিষা দিয়ে ভর্ত্তি করেছি। ভাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক সুরটাকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে বাহির হতে সুর যোজনা করতে হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার জরি-জহরতের ঝালরওয়ালা দেড় হাত দু হাত ঘোমটার আড়ালে আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাসি সমস্ত ঢাকা প'ড়ে গেছে, তার কালো চোখের কটাক্ষে যে কত তীক্ষ্ণতা তা আমরা ভুলে গেছি। আমি তার সেই সংস্কৃত ঘোমটা খুলে দেবার কিছু সাধনা করেছি, তাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করেছে। সাধু লোকেরা জরির

আঁচলাটা দেখে তার দর যাচাই করুক; আমার কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তার চেয়ে অনেক বেশি; সে যে বিনামূল্যের ধন, সে ভট্চাজপাড়ার হাটে বাজারে মেলে না। * * *

১

[নিম্নের পত্র ৩ খানি শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

(ক)

গানের আলাপের সঙ্গে "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয়নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সঙ্গীতের সমস্তটাই অনির্ব্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্ব্বচনীয়তা

সেইটেকেই বেষ্টন ক'রে হিল্লোলিত হোতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্য্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্ব্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।" বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন "এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।" যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে একথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূল খাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ ব'লে উল্লাস না ক'রে আধিভৌতিকতার অভাব ব'লে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

"পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর ক'রে

ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। এ'কে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলঙ্কৃত করা হয় না। তা হোক্, পাশেই আছেন কাঁকন-পরা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী. তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্চেন। নিজের রচনা নিয়ে অহঙ্কার করছি মনে ক'রে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্ত্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্চে না, তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারি আলোচনা চল্‌ছে। বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ ব'লেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে ব'লেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বল্‌লেও সেটাকে বলব স্পর্দ্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহ-সভায় চন্দনচর্চ্চিত বর কানে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুৎ প'ড়ে

চলেছে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসছে সাহানা রাগিণীতে সানাইয়ের সঙ্গীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই সানাই বাজনা সেই মন্ত্র পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসীর জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্চে বচন অনির্ব্বচনের সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারোমাস চলবে না। তাই ব'লেই তো নীরবিত সাহানা সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই বর বধূর মহাশূন্যে অন্তর্দ্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হোলো কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসীটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দ্দশপদীর পদক্ষেপটা

প্রতিদিন মানায় না। তাই ব'লেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে প'ড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করিনে। এমন কি বাম-দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হোলো আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হোলো এই যে উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসার-যাত্রার বৈচিত্র্য সহজরূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনো ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের ক'রে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলঙ্কৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হোতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্ম্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রু-

বিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস আদি কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল ক'রে আঁকবার জন্যেই, এমন কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রং-ফলানো চওড়া ব'লেই লোকে ঐটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে "উত্তররামচরিত" রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ঐ দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহোলে সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হাল্‌কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চল্‌তে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ,

রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন ক'রে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নাঘর, বাসরঘর পর্য্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই ক'রে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্ব্বত্র। সেই গতি-ভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া-বাঁচিয়ে পোষাকী সাড়ির প্রান্ত তুলে-ধরা আধা ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ৎ। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য্য হয়ে বসব না, এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে ক'রেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্য্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈব দুর্য্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারী বাধলে আমাকে স্বদলের লোক ব'লে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দ্দিনের পূর্ব্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম "বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে ক'রে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেছিলে। বড়ো চিঠিই যে ভালো চিঠি এমন মোহ মনে স্থান দিয়ো না। ইতি দেওয়ালি, ১৩৩৯।

(খ)

সম্প্রতি কতকগুলো গদ্যকবিতা জড়ো ক'রে "শেষসপ্তক" নাম দিয়ে একখানি বই বের করেছি। সমালোচকরা ভেবে পাচ্চেন না ঠিক কী বল্‌বেন। একটা কিছু সংজ্ঞা দিতে হবে, তাই বল্‌ছেন আত্মজৈবনিক। অসম্ভব নয় কিন্তু তাতে বলা হোলো না এগুলো কবিতা কিম্বা কবিতা নয় কিম্বা কোন্ দরের কবিতা। এদের সম্বন্ধে মুখ্য কথা যদি এই হয় যে এতে কবির আত্মজীবনের পরিচয় আছে তাহোলে পাঠক অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌তে পারে, আমার তাতে কী। মদের গেলাসে যদি রং-করা জল রাখা যায় তাহোলে মদের হিসাবেই ওর বিচার আপনি উঠে পড়ে। কিন্তু পাথরের বাটিতে রঙীন পানীয় দেখলে মনের মধ্যে গোড়াতেই তর্ক ওঠে ওটা সরবৎ না ওষুধ; এরকম দ্বিধার মধ্যে প'ড়ে সমালোচক এই কথাটার 'পরেই জোর দেন যে, বাটিটা জয়পুরের কি মুঙ্গেরের। হায়রে, রসের যাচাই করতে যেখানে পিপাসু এসেছিল সেখানে মিল্‌ল পাথরের বিচার। আমি কাব্যের পসারী, আমি সুধোই, লেখাগুলোর

ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গী নেই, থেকে থেকে কটাক্ষ নেই, সদর দরজার চেয়ে এর খিড়কির দুয়ারের দিকেই কি ইসারা নেই, গদ্যের বকুনির মুখে রাস টেনে ধ'রে তার মধ্যে কি কোথাও তুল্‌কির চাল আনা হয় নি, চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগ্‌ল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি? সেই সংযমের গুণে থেমে যাওয়া কিম্বা হঠাৎ বেঁকে যাওয়া কথার মধ্যে কোথাও কি নীরবের সরবতা পাওয়া যাচ্চে না? এই সকল প্রশ্নের উত্তরই হচ্চে এর সমালোচনা। কালিদাস "রঘুবংশে"-র গোড়াতেই বলেছেন বাক্য এবং অর্থ একত্র সংপৃক্ত থাকে, এমন স্থলে বাক্য এবং অর্থাতীতকে একত্র সংপৃক্ত করার দুঃসাধ্য কাজ হচ্চে কবির, সেটা গদ্যেই হোক আর পদ্যেই হোক তাতে কী এল গেল? যাক্‌গে এ সব তর্ক! রচনার পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে নিজের নাম ও খ্যাতিকে সওয়ার করিয়ে হাটের ভিড়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার যে নেশা ছেলেবেলা থেকে মনকে পেয়ে বসেছে সেটাকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেবার জন্যে আজকাল অত্যন্ত একটা ইচ্ছে হয়েছে। বড়ো কঠিন। আহার্য্য থেকে বিরত হয়ে

উপোষ করা তেমন দুঃসাধ্য নয় মৌতাত থেকে যেমন দুঃসাধ্য। এই সাধনায় সিদ্ধ হোতে না পারলে মানুষের কিছুতে শান্তি নেই। জীবনে জয়মাল্য যদি পাবারই হয় তাহোলে সবার অগোচরে অন্তর্যামীর হাত থেকে নিয়ে যদি যেতে পারতুম তাহোলে সার্থক হোত জীবন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচ্ছন্ননামাদের সম্প্রদায়ে দীক্ষা নেবার রাস্তা আমার বন্ধ—কিন্তু লোকমুখের খ্যাতি মোহের মূঢ়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে আমার সংকল্প যেন শেষদিন পর্য্যন্ত জাগরূক থাকে এই আমার কামনা। ৩ জুন, ১৯৩৫

(গ)

অন্তরে যে ভাবটা অনির্ব্বচনীয় তাকে প্রেয়সী নারী প্রকাশ করবে গানে নাচে এটাকে লিরিক ব'লে স্বীকার করা হয়। এর ভঙ্গীগুলিকে ছন্দের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ; তারা সেই ছন্দের শাসনে পরস্পরকে যথাযথ-ভাবে মেনে চলে ব'লেই তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সম্মিলিত গতিতে একটি শক্তির উদ্ভব হয়, সে আমাদের মনকে প্রবল বেগে আঘাত দিয়ে থাকে। এর জন্যে বিশেষ

প্রসাধন, আয়োজন, বিশেষ রঙ্গমঞ্চের আবশ্যক ঘটে। সে আপনার একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করে, একটি দূরত্ব।

কিন্তু একবার সরিয়ে দাও ঐ রঙ্গমঞ্চ, জরির আঁচলা-দেওয়া বেনারসী সাড়ী তোলা থাক্ পেটিকায়, নাচের বন্ধনে তনু দেহের গতিকে মধুর নিয়মে নাইবা সংযত করলে, তাহোলেই কি রস নষ্ট হোলো? তাহোলেও দেহের সহজ ভঙ্গীতে কান্তি আপনি জাগে, বাহুর ভাষায় যে বেদনার ইঙ্গিত ঠিক্‌রে ওঠে সে মুক্ত ব'লেই যে নিরর্থক এমন কথা যে বলতে পারে তার রসবোধ অসাড় হয়েছে। সে নাচে না ব'লেই যে তার চলনে মাধুর্য্যের অভাব ঘটে কিম্বা সে গান করে না ব'লেই যে তার কানে কানে কথার মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকে না একথা অশ্রদ্ধেয়। বরঞ্চ এই অনিয়ন্ত্রিত কলায় একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা, আপন আন্তরিক সত্যেই তার আপনার পর্য্যাপ্তি। তার বাহুল্যবর্জ্জিত আত্মনিবেদনে তার সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কাছের সম্বন্ধ ঘটে। অশোকের গাছে সে আল্‌তা-আঁকা নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাত নাই করল; না হয় কোমরে আঁট আঁচল বাঁধা, বাঁ-হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান

হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউ শাক তুলছে, অযত্নশিথিল খোঁপা ঝুলে পড়েছে আল্‌গা হয়ে; সকালের রৌদ্র-জড়িত ছায়াপথে হঠাৎ এই দৃশ্যে কোনো তরুণের বুকের মধ্যে যদি ধক্‌ ক'রে ধাক্কা লাগে তবে সেটাকে কি লিরিকের ধাক্কা বলা চলে না—না হয় গদ্য-লিরিকই হোলো। এ রস শালপাতায় তৈরি গদ্যের পেয়ালাতেই মানায়, ওটাকে তো ত্যাগ করা চলবে না। প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে একটি স্বচ্ছতা আছে তাব মধ্য দিয়ে অতুচ্ছ পড়ে ধরা—গদ্যের আছে সেই সহজ স্বচ্ছতা। তাই ব'লে একথা মনে কবা ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে। ও যেন বনস্পতির মতো, তার পল্লবপুঞ্জের ছন্দোবিন্যাস কাটাছাঁটা সাজানো নয়, অসম তার স্তবকগুলি, তাতেই তার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য।

প্রশ্ন উঠবে গদ্য তাহোলে কাব্যের পর্য্যায়ে উঠবে কোন্‌ নিয়মে। এর উত্তর সহজ। গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিণী ব'লে কল্পনা করো, তাহোলে জানবে তিনি তর্ক করেন, ধোবার বাড়ির কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশী সর্দ্দি জ্বর প্রভৃতি হয়, "মাসিক বসুমতী" পাঠ ক'রে

অথবা প্রত্যেক চার মাত্রায় ঝোঁক দিয়ে পয়ার পড়া যেতে পারে। যেমন—

সুনিবিড় | শ্যামলতা | উঠিয়াছে | জেগে ০ ০ |
ধরণীর | বনতলে | গগনের | মেঘে ০ ০ |

অনেকগুলি ছন্দ আছে যাতে খানিকটা ক'রে বড়ো মাত্রাকে একটি ক'রে ছোটো মাত্রা দিয়ে বাধা দেবার কায়দা দেখা যায়। দশ মাত্রার ছন্দ তার দৃষ্টান্ত—এর ভাগ আট+দুই, অথবা, চার+চার+দুই।

| | |
মোর পানে | চাহ মুখ | তুলি' |
| | |
পরশিব | চরণের | ধূলি |

ছয়মাত্রার ছন্দেও এরূপ বড়ো ছোটোর ভাগ চলে। সে ভাগ ছয়+দুই, অথবা, তিন+তিন+দুই। যেমন—

আঁখিতে | মিলিল | আঁখি |
হাসিল | বদন | ঢাকি' |
মরম-বারতা সরমে মরিল
কিছু না রহিল বাকি।

ধ্বনিরূপ সৃষ্টিতে দুই সংখ্যার একটি বিশেষ প্রভাব

আছে, তিন সংখ্যা থেকে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেখাই—

> শ্রাবণ ধারে সঘনে
> কাঁদিয়া মরে যামিনী,
> ছোটে তিমির গগনে
> পথ-হারানো দামিনী।

এই ছন্দটির সমগ্র অবয়ব ষোলো মাত্রায়; সেই ষোলো মাত্রাটি সংঘটিত হচ্ছে ৩+২+৩ মাত্রার যোগে, এই জন্যেই পয়ারের মতো এর চালচলন নয়। যে আট মাত্রা দুইয়ের অংশ নিয়ে, সে চলে সোজা সোজা পা ফেলে কিন্তু যে আট মাত্রা তিন দুই তিনের ভাগে, সে চলছে হেলতে দুলতে মরাল গমনে।

> চেয়ে থাকে মুখপানে,
> সে চাওয়া নীরব গানে মনে এসে বাজে,
> যেন ধীর ধ্রুবতারা
> কহে কথা ভাষাহারা জনহীন সাঁঝে।

যতিমাত্রাসমেত ২৪ মাত্রায় এই ত্রিপদীর অবয়ব। এই ২৪ মাত্রা দুই মাত্রাখণ্ডের সমষ্টি, এই জন্যেই এ'কে পয়ারশ্রেণীতে গণ্য করব।

রিমি ঝিমি বরিষে শ্রাবণধারা
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনি ঝিনি ;
দুরু দুরু অন্তরে বিরহকাতরা
তাকায়ে পথপানে বিরহিণী।

এ ছন্দেরও অবয়ব ২৪ মাত্রায় কিন্তু এর গড়ন স্বতন্ত্র ; এর অংশগুলি দুই তিনের মিশ্রিত মাত্রা।

পয়ার ছন্দের বিশেষ গুণ এই যে, তার বুনোনি ঠাস্ বুনোনি নয়, তাকে বাড়ানো কমানো যায়। সুর ক'রে টেনে টেনে পড়বার সময় কেউ যদি যতির যোগে পয়ারের প্রথম ভাগে দশ ও শেষ ভাগে আট মাত্রা পড়ে তবু পয়ারের প্রকৃতি বজায় থাকে। যেমন—

মহাভারতের কথা ০ ০ | অমৃত সমান ০ ০।
কাশিরাম দাস ভণে ০ ০ | শুনে পুণ্যবান ০ ০।

অথবা—

মহা ০ ভারতের কথা ০ ০ | অমৃত ০ ০ সমা ০ ০ ন।
কাশিরা ০ ০ ম দাস ভণে ০ ০ | শুনে ০ ০ পুণ্যবান ০ ০।

পয়ার ছন্দ স্থিতিস্থাপক ব'লেই এটা সম্ভব, আর সেই গুণেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে সে এমন ক'রে অধিকার করেছে।

যেমন দুইমাত্রামূলক পয়ার তেমনি তিনমাত্রামূলক

ছন্দও বাংলাদেশে অনেককাল থেকে প্রচলিত। পয়ারের ব্যবহার প্রধানত আখ্যানে, রামায়ণ, মহাভারত মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে। তিনমাত্রামূলক ছন্দ গীতিকাব্যে, যেমন বৈষ্ণব পদাবলীতে।

পূর্ব্বেই বলেছি পয়ারের চাল পদাতিকের চাল, পা ফেলে ফেলে চলে—

> অভিসার যাত্রাপথে হৃদয়ের ভার
> পদে পদে দেয় বক্ষে ব্যথার ঝঙ্কার।

এই পা ফেলে চলার মাঝে মাঝে যতি পাওয়া যায় যথেষ্ট, ইচ্ছা করলে তাকে বাড়ানো কমানো চলে। কিন্তু তিনমাত্রার তালটা যেন গোল গড়নের, গড়িয়ে চলে, পরস্পরকে ঠেলে নিয়ে দৌড় দেয়।

> চলিতে চলিতে চরণে উছলে
> চলিবার ব্যাকুলতা,
> নূপুরে নূপুরে বাজে বনতলে
> মনের অধীর কথা।

এই জন্যে মাত্রা যদি কোথাও তিনের মাপের একটু বেশি হয় এ ছন্দ তাকে প্রসন্ন মনে জায়গা দিতে পারে

না। দায়ে প'ড়ে এই অত্যাচার কখনো করি নি, এমন কথা বল্‌তে পারব না।

> প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি,
> ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি',
> অনাথপিণ্ডদ কহিলা অম্বুদ-
> নিনাদে।

এ কথা বোঝা শক্ত নয় যে, অনাথপিণ্ডদ নামটার খাতিরে নিয়ম রদ করেছিলেম। গার্ড এসে গাড়ির কামরায় বরাদ্দর বেশি মানুষকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ঘুষ খেয়ে থাকবে কিম্বা আগন্তুক ভারি দরের।

সেকালে অক্ষর-গণতি-করা তিনমাত্রামূলক ছন্দে যুক্তধ্বনি বর্জ্জন ক'রে চল্‌তুম। কিন্তু তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্ব্বলতা এসে পৌঁছত। সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হোলো তখন যুক্তধ্বনির শরণ নিলুম। ছন্দটা একদিন ছিল যেন ননী দিয়ে গড়া।—

> বরষার রাতে জলের আঘাতে
> পড়িতেছে যূথী ঝরিয়া।
> পরিমলে তারি সজল পবন
> করুণায় উঠে ভরিয়া॥

এই দুর্ব্বলতার মধ্যে যুক্তবর্ণ এসে দেখা দিল—

নব বর্ষার বারিসংঘাতে
পড়ে মল্লিকা ঝরিয়া,
সিক্ত পবন সুগন্ধে তারি
কারুণ্যে উঠে ভরিয়া।

তিন তিন মাত্রায় যার গ্রন্থিযোজনা এমন আর একটি ছন্দের দৃষ্টান্ত দেখাই—

আঁখির পাতায় নিবিড় কাজল
গলিছে নয়ন সলিলে।

অক্ষর সংখ্যা সমান রেখে এই দুটো পদে যুক্তবর্ণ যদি চড়াই তাহোলে সেটা কেমন হয়, যেমন এক এক সময়ে দেখা যায় জোয়ান পুরুষ ক্ষীণ স্ত্রীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে পথে চলে নির্ম্মমভাবে। প্রমাণ দিই—

চক্ষুর পল্লবে নিবিড় কজ্জল
গলিছে অশ্রুর নির্ঝরে।—

কিন্তু এই বোঝা পয়ার জাতীয় পালোয়ানের স্কন্ধে চাপালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাক্‌বে না। প্রথমে বিনা বোঝার চালটা দেখানো যাক্।

শ্রাবণের কালো ছায়া নেমে আসে তমালের বনে
যেন দিক্‌ললনার গলিত কাজল বরিষণে॥

এটিকে গুরুভার ক'রে দিই—

> বর্ষার তমিস্রচ্ছায়া ব্যাপ্ত হোলো অরণ্যের তলে
> যেন অশ্রুসিক্তচক্ষু দিগ্বধূর গলিত কজ্জলে।

এতটা ভারবৃদ্ধি যে সম্ভব হয় তার কারণ পয়ার স্থিতিস্থাপক।

ধ্বনির দুইমাত্রা এবং তিনমাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিকমাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। ৩+২, ৩+৪, ৩+২+৪ প্রভৃতি নানাপ্রকার যোগ চলেছে আধুনিক বাংলা ছন্দে।

তিন+দুইমাত্রামূলক ছন্দের দৃষ্টান্ত—

> আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
> অযুত কোটি তারা।
> আপন কারা-ভবনে পাছে
> আপনি হয় হারা।

দেখা যাচ্চে এখানে পদ-শেষের অংশটিকে খর্ব্ব করা হয়েছে। যদি লেখা যেত—

> আঁধার রাতি জ্বেলেছে বাতি
> আকাশ ভরি' অযুত তারা

তাহোলে ছন্দের কাছে দেনা বাকী থাক্‌ত না।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্লোকটির পদশেষে পাঁচমাত্রার থেকে তিনমাত্রাকে জবাব দেওয়া হয়েছে। তাহোলে বুঝতে হবে সেই তিনমাত্রা দেহত্যাগ ক'রে ঐখানেই ব'সে আছে যতিকে ভর ক'রে।

কিন্তু এই কৈফিয়ৎটা সম্পূর্ণ হোলো ব'লে মনে হয় না, আরো কথা আছে। প্রকৃতির কাজের অলঙ্করণ তত্ত্বটা আলোচ্য। দুই পা দুই হাত নিয়ে দেহটা দাঁড়াল—দুই কাঁধে দুটো মুণ্ড বসালেই সম্মিতি অর্থাৎ symmetry ঘট্‌ত—তা না ক'রে দুই কাঁধের মাঝখানে একটি মুণ্ড বসিয়ে সমাপ্তিটা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার গাছে ডাঁটার দুধারে দুটি ক'রে পত্রগুচ্ছ চল্‌তে চল্‌তে প্রান্তে এসে থামল একটিমাত্র গুচ্ছে। অলঙ্করণের ধারা যেখানে পূর্ণ হয়েছে সেখানে একটিমাত্র তর্জ্জনী, ছোটো একটি ইসারা।

সকল ভাষারই যতি আছে, কিন্তু যতিকে বাটখারা-স্বরূপ ক'রে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কি না জানি নে। সংস্কৃত ছন্দে এই রীতি বিরল তবু একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী

হরতি দরতিমিরমতি ঘোরং ০ ০।

যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়া আবৃত্তি করবার সময় আপনি যতির জোগান দেয় আমাদের কান।

কাক কালো বটে পিক সেও কালো,
কালো সে ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো যে কন্যা
তোমার চিকণ কেশ।

এমন ক'রে ছন্দটাকে পুরোপুরি ভরিয়ে দিলে কানের কাছে ঋণী হোতে হোত না। কিন্তু এতে ছড়ার জাত যেত। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে, এ দুইয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রকৃতি আমের মধুরতায় জল মিশিয়েছেন তাকে আমসত্ত্ব ক'রে তোলেন নি, সে জন্যে রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই কৃতজ্ঞ। তেমনি যথেষ্ট যতি মিশোল করা হয়েছে ছড়ার ছন্দে, শিশুকাল থেকে বাঙালি তাতে আনন্দ পায়। সে সহজেই আউড়েছে—

কাক কালো, কোকিল কালো,
কালো ফিঙের বেশ,

তাহার অধিক কালো কন্যে
তোমার চিকণ কেশ

কিম্বা

টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে,
লোকে বলে কী।
শালুক রাজা বিয়ে করে
ঝিনুক রাজার ঝি।

গদ্যছন্দ

("পূর্ব্বাশা"-সম্পাদককে লিখিত পত্র)

গদ্য বলতে বুঝি যে-ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। আর রসাত্মক বাক্যকেই আলঙ্কারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্য কাব্য, আর গদ্যে বললে হবে গদ্য কাব্য। গদ্যেও অকাব্য ও কুকাব্য হোতে পারে পদ্যেও তথৈবচ। গদ্যে তার সম্ভাবনা বেশি, কেননা ছন্দেরই একটা স্বকীয় রস

আছে—সেই ছন্দকে ত্যাগ করে যে কাব্য, সুন্দরী বিধবার মতো তার অলঙ্কার তার আপন বাণী-দেহেই, বাইরে নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে. গদ্য কাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে, আন্তরিক প্রবর্ত্তনা থেকে কাব্য সেই ছন্দ চলতে চলতে আপনি উদ্ভাবিত করে, তাব ভাগগুলি অসম হয় কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে ভার-সামঞ্জস্য থেকে সে স্খলিত হয় না। বড়ো ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়—যেমন—

মেঘৈর্মেদুর। মম্বরম্বনভুবঃ।
শ্যামাস্তমা। লদ্রুমৈঃ॥

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রেব ওজন মেনে চলে। মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিঃশ্বাসেব বেগে ঢেউ খেলায় না, যেমন,—

“তার চেহারাটা মন্দ নয়”

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগবামাত্র ঝোঁক এসে পড়ে, যেমন—

“কী সুন্দর তার চেহারাটি।”

এ'কে ভাগ করলে এই দাঁড়ায়—

> "কী সুন্‌ | দর তার্‌ | চেহারাটি।"
>
> "মরে যাই তোমার বালাই নিয়ে।"
>
> "এত গুমর সইবে না গো, সইবে না—এই ব'লে দিলুম।"
>
> "কথা কয় নি তো কয় নি
> চলে গেছে সামনে দিয়ে,
> বুক ফেটে মরব না তাই ব'লে।"

এ সমস্তই প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্য, কাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত। মনকে খবর দেবার সময় এর দরকার হয় না, ধাক্কা দেবার সময় আপনি দেখা দেয়, ছান্দসিকের দাগ-কাটা মাপ কাঠির অপেক্ষা রাখে না। ইতি—১১ মে, ১৯৩৫